Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমতা। সমতার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর লড়াই-এর মূল্যবান গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গেলে বা সমতার দাবির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। যে মুহূর্তেই, সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম ও মজুরীর সমতা অর্জিত হবে— সেই মুহূর্তেই মানবতার কাছে আনুষ্ঠানিক সমতার প্রশ্ন থেকে প্রকৃত সমতার স্তরে উত্তরণের গতিময়তার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে। —**লেনিন**

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

মোদী জমানায় ফ্যাসিবাদী শাসন... ১

দেশে-বিদেশে ২

শ্রীহীন দ্বীপরাষ্ট্রে লঙ্কাকান্ড ৩

জ্বালানি শক্তি ও সংঘ পরিবার... ৪

শিক্ষা ভাবনা ও সাম্প্রতিক সমস্যা ৫

বিরোধিতা ও অপরাধ সমার্থক নয় ৬

চা-বাগান, মহিলা শ্রমিকদের সংকট ৭

সুপরিকল্পিত ভাবেই ভন্ডামি করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৮

70th Year 18th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 9th July & 16th July 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী বিকৃত অশোকস্তম্ভ উদ্‌বোধন করলেন

সম্প্রতি নতুন নির্মীয়মান সংসদ ভবনে 'হিন্দু প্রধানমন্ত্রী' অশোক স্তম্ভের বিকৃত স্থাপত্য উদ্‌বোধন করলেন। ২৫০ খ্রিস্টপূর্বে নির্মিত অশোক স্তম্ভে সিংহ চতুষ্টয়ের শান্ত গাম্ভীর্য অন্তর্দৃষ্টি অলংকৃত মুখমন্ডল এবং এর সামগ্রিক বহুত্ববাদী দ্যোতনার ইতিহাস দেশবাসী কতটুকুই বা জানেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আগ্রাসী চেতনায় বর্তমান স্থাপত্যের রক্তলোলুপ শদন্ত বিকশিত স্ফীত কেশর সমন্বিত চারটি সিংহ সমন্বিত মূর্তিটির উদ্বোধন লগ্নেই দুটি ভাবনা এবং সংস্কৃতির বিরোধাভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। পুরানো জাতীয় প্রতীক নির্মাণের ইতিহাস সম্পর্কে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে যে বিশেষ শিল্পী গোষ্ঠীর হাতে এটি অঙ্কন ও নির্মাণের দায়িত্ব ছিল, তাঁদের প্রথম সারির শিল্পী দীননাথ ভার্গবের পারিবারিক সদস্যরা সেই অজ্ঞাত ইতিহাস দেশবাসীর কাছে উন্মোচিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে মূল অশোকস্তম্ভের রূপটি চিত্রণের আগে দীননাথ ভার্গবের নেতৃত্বে শান্তি নিকেতনের কলাভবনের শিল্পীরা দিনের পর দিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহের স্বভাববৈচিত্রের রূপটি লক্ষ করেছেন। তাই ভার্গবের পরিবারের সদস্যরা এককথায় এই মহিমান্বিত এবং সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৌম্য রূপটির সারস্বত ভাবনাটি মোদীর নেতৃত্বে পদদলিত করার জন্য যারপরনাই ব্যথিত।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ভারতের সংবিধানে জাতীয় প্রতীক স্বরূপ অশোক স্তম্ভ চিত্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুকে। নন্দলাল বসু তাঁর কৃতি ছাত্রদের গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে ছিলেন দীননাথ ভার্গব, এই দায়িত্ব অর্পণ করেন।

দীননাথ ভার্গবের স্ত্রী প্রভা ভার্গব (৮৫) দীর্ঘ তিনমাস ধরে কী ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে কলাভবনের শিল্পীরা এই কাজ করেছেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন। এমনকি, ভার্গবের চিত্রিত মূল চিত্রটিও তাঁদের পরিবারের মূল্যবান সম্পদরূপে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এই অপকীর্তি যে ভয়ানক আগ্রাসী হিন্দুরাষ্ট্রের সূচনা করছে তার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদই নয়, দেশজুড়ে তীব্র ধিক্কার ও গণআন্দোলন গড়াই একমাত্র বিকল্প।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি-বিরোধী ঐক্যে ফাটল

বিজেপির আগ্রাসী আর্থরাজনীতি এবং সংবিধানের সেকুলার গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্রৌপদী মূর্মুর বিরুদ্ধে লড়াই-এর একটা প্রচেষ্টা চলছিল। অনেক জল ঘোলা করে যশোবন্ত সিন্হাকে প্রার্থী করা হয়েছিল। অর্থাৎ এভাবে ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ করার পক্ষে দেশবাসীর কাছে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছিল বামদল ও কংগ্রেসসহ অধিকাংশ আঞ্চলিক দল। কিন্তু দুঃখের কথা যে যতদিন অতিক্রান্ত হতে লাগল ততই এই বিজেপি বিরোধী মঞ্চের বিষয়টা ক্রমশ জোলো হতে শুরু করল। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে মহারাষ্ট্র বিকাশ আগাড়ি সরকারের অধিকাংশ শিবসেনা বিধায়ককে ভাঙিয়ে নতুন সরকার গড়ল বিজেপি। প্রাক্তন শিবসেনা মুখ্যমন্ত্রী অনেকদিন কংগ্রেস-এন সি পি জোটে থাকলেও এখন ক্রমশ সুর বদলাচ্ছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উদ্ধব দ্রৌপদীকে সমর্থন করে প্রমাণ করতে উৎসুক শিবসেনা আছে শিবসেনাতেই, বিজেপি'র উগ্র হিন্দুত্বের বলয়ে।

এদিকে বিজেপি সরকারের মারাত্মক চাল, হয় টাকার তোড়া, নয় সিবিআই, ইডি, সেবির আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করছে এক এক করে আঞ্চলিক দল। বি এস পি, আকালি দল, জনতা দল (স) ইতিমধ্যেই বিজেপির প্রার্থীকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে। সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা ব্যানার্জী বিবৃতি দিয়েই রেখেছেন আগে জানলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে মহিলা জনজাতির প্রার্থীকেই তিনি সমর্থন করতেন। আর সম্প্রতি দার্জিলিঙে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন রাজ্যপাল ধনখড়। ইডি, সিবিআইয়ের চাপ কমাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কি ভূমিকা নেবেন বঙ্গেশ্বরী কে তা বলতে পারে। এভাবেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামগণতান্ত্রিক মঞ্চের ভিতটা নড়বড়ে করে দিচ্ছে আপাতমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত আঞ্চলিক দলগুলি।

মোদী জমানায় ফ্যাসিবাদী শাসনের ঝোঁক প্রবলতর বামপন্থীদের দায়িত্ব দুর্বার আন্দোলনে এই ঝোঁকের মোকাবিলা

অমিত বিক্রমশালী সম্রাটের রাজত্বে রাজ নিন্দা গর্হিত অপরাধ। যদি কোনও ব্যক্তি ভুলক্রমে রাজা বা সম্রাটের সামান্যতম নিন্দাও প্রকাশ্যে করেন তা হলে, তাঁর শিরশ্ছেদ অনিবার্য। মুন্ডু কাটা না গেলেও শূলে চড়িয়ে হত্যা করা অবশ্যই রাজধর্ম। সম্রাট তো ঈশ্বরের প্রতিভূ। তাঁকে সরাসরি স্বর্গরাজ্য থেকে মর্তের দৈনন্দিন পরিচালনায় ঈশ্বর প্রেরণ করেন। সুতরাং তাঁর নিন্দা করার একমাত্র অর্থ স্বয়ং ভগবানের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এমন অপরাধ অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য।

অতীতে, সুদূর অতীতে অত্যাচারী রাজা বা সম্রাটের রাজত্বে এমন দুঃসহ বিধান স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। কত জ্ঞানীগুণী মানুষও যে এমন অত্যাচারী শাসকের কোপদৃষ্টিতে পড়ে অসহায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তার কোনও লিখিত ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। তাছাড়া, ইতিহাসতো রচিত হত মূলত রাজার নির্দেশে। সেইসব ইতিহাসে রাজার কীর্তির বর্ণনাই মুখ্য ছিল। সাধারণ দরিদ্র বা জ্ঞানী মানুষদের সামান্য অপরাধে হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা ছিল রীতিবিরুদ্ধ। এর ফলে আধুনিক কালের মানবসমাজ এমনকি পণ্ডিতরা পর্যন্ত সে সব অত্যাচারের বিশদ বিবরণ প্রায় জানেনই না।

রাজতন্ত্রে যেমন রাজার ইচ্ছা অনিচ্ছাই চূড়ান্তভাবে মান্য ছিল, তেমনই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটার পরেও বিভিন্ন দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের ইতিহাস আমরা কম বেশি জানি। আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এ ধরনের স্বৈরশাসকদের অবিশ্বাস্য অত্যাচারের কাহিনীগুলিও আধুনিক মানবসমাজের অনেকের চেতনায় রয়েছে। অনেক অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রী শাসকের বিরুদ্ধে দেশের বহুজনের দুকূলপ্লাবী প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং অনেকক্ষেত্রে সেইসব শাসকের গণরোষে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। অনেক অপশাসক আবার কোনক্রমে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে।

আধুনিক কালেও এমন চরাচরব্যাপ্ত হিংসা দ্বেষ এবং অসহিষ্ণুতাপূর্ণ শাসকের দেখা মেলে। হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী অপশাসনের বৃত্তান্ত বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে এক বহুচর্চিত কলঙ্ক। এই উভয় নরাধমকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছিল। একজন আত্মহত্যার শিকার আর ইতালির মুসোলিনী তো গণরোষের প্রবল অভিঘাতে প্রকাশ্য রাজপথে নিহত হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও কিন্তু স্বৈরশাসকদের দেখা মেলে আজও।

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি পরিচালনার নামেও নিষ্ঠুর-নির্মম এক ব্যক্তির ওপর নির্ভর শাসন মানুষকে এযুগেও শিহরিত করে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হবার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। মানুষ নিশ্চুপ হয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ ও যথাযথ মূল্যবোধের সন্ধান করতেও ক্রমে ভুলে যায়। এটাই অভ্যাসে পরিণত হয় এবং ঘোষণায় গণতান্ত্রিক শাসন থাকলেও বাস্তবে তা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে অবনত হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনোত্তর ইতিহাসে অতীতে এমন স্বৈরশাসনের সন্ধান মেলে কোনো কোনো সময়। কিন্তু এমন ধারাবাহিকভাবে নির্মম স্বৈরশাসনের কবলে ভারত বা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পড়েনি। একসময় দেশের শাসক এমারজেন্সি ঘোষণা করে সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করেছিল। সেই প্রায় উনিশ মাস ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েছিল। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই শাসকের পতন ঘটেছিল।

বর্তমান সময়ে মোদী রাজত্বে ঘোষিত 'এমারজেন্সি'র সন্ধান মিলবে না। কিন্তু, শাসন পরিচালনায় তার চাইতেও বেশি গণতন্ত্রহীনতা যত্রতত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। একই প্রসঙ্গ প্রযোজ্য উত্তর প্রদেশে আদিত্যনাথ বা পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও।

দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং বিনা বিচারে দীর্ঘকাল কারাগারের অন্ধকারে জীবনমৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা। ফাদার স্ট্যান স্বামীর মতো কোনও অনন্য সমাজসেবীর অসহায় মৃত্যুও শাসকদের বিবেক বা নৈতিকতায় স্পর্শ করে না। অবশ্য সেগুলির কোনও অস্তিত্ব এ ধরনের শাসকরা বহন করেন না। বিবেক বা যথাযথ মূল্যবোধসম্পন্ন কোনও মানুষ আগ্রাসী পুঁজিবাদের তল্পিবাহক হতে পারেন না। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কতিপয় কর্পোরেট ব্যবসায়ীর অন্ধ দালালি করে না যা, মোদী সরকার অক্লেশে করে চলেছে।

আরও অনেক বেশি আশঙ্কার বিষয়, সর্ববিধ অনৈতিক অপকর্ম করলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ বিতর্ক সভা সংসদের উভয়কক্ষে কোনও এম পি যদি 'জুমলা' শব্দটি, যার মানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একান্ত প্রিয় ও ব্যবহৃত উচ্চারিত শব্দ প্রয়োগের প্রসঙ্গে মুখ খুলতে পারবেন না। ওই শব্দটিকে অসংসদীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ''জুমলা জীবি'' অর্থাৎ যিনি শুধুই বড় বড় কথা বলেন এবং কাজের কাজ কিছুই করেন না যেমন, স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী, সে কথা সংসদে বলা বারণ। মোদি নিঃসন্দেহে একনায়ক বা স্বৈরতন্ত্রী অর্থাৎ তাঁর আচরণ 'ডিক্টেটোরিয়াল" কিন্তু বলা যাবে না। তাঁকে কখনোই 'তানাশাহ' মানে ডিক্টেটর বলা যাবে না। সংসদে এসব শব্দ অসংসদীয় বলে ঘোষিত হয়ে গেছে।

শুধু কি এটুকুই নাকি? দাঙ্গা বাঁধানো বা সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে প্রশ্রয় দেওয়া সংঘপরিবার নিয়ন্ত্রিত মোদী সরকারের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু, দাঙ্গা শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারবে না। 'কুম্ভীরাশ্রু' বর্ষণ করা মেকী রাজনৈতিক নেতাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও তা বলা যাবে না। নিজের ঢাক নিজে পেটানো তো মোদী, মমতা, আদিত্যনাথ বা সমগোত্রীয় শাসকদের বিশেষ অপগুণ। তা কিন্তু সংসদে বলা যাবে না। মোদী নাটক করছেন এমন কথাও উচ্চারণ করা বারণ। মোদী নাটকই শুধু নয়, তিনি অতি নিম্ন শ্রেণির যাত্রাপালার অভিনেতা হিসেবে সংসদের বিতর্কে বা জনসমক্ষে অবাধে বিচরণ করলেও তা নিয়ে সংসদ বিতর্কে কিন্তু বলা যাবে না।

আরও আছে। অনেক আছে। মোদীকে বাঁচাতে অথবা তাঁর মতো মহামহিম ব্যক্তিকে বিড়ম্বনায় যেন না পড়তে হয় সেজন্য, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থাই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে। স্পীকার নিজে মোদীর অন্যতম স্তাবক। তিনিই নাকি উদ্যোগী হয়ে এইসব ভাষাগত নিষেধাজ্ঞা জারি করার ব্যবস্থা করছেন। তাঁর এবং বিজেপি'র সংসদীয় নেতারা একযোগে এমন সব অনৈতিক কুকর্ম করে চলেছে। এই জমানায় ভক্তদের সংখ্যা অগুনতি।

এখন ভারতীয় সংসদে বলা যাবে না যে, সরকার অসত্য বিবৃতি দিচ্ছে। 'অসত্য' শব্দটি অসংসদীয়। 'অহংকার' শব্দটিও বাদ। 'উল্টা চোর কোতোয়ালকো ডাঁটে' একটি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত শব্দবন্ধ। বহুল ব্যবহৃত। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সংসদীয় বক্তব্যে বহুদিন যাবৎ নির্বাধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখন আর বলা যাবে না। বহু ইংরাজি শব্দ যেমন 'ফেক', 'শো অফ্' বা 'স্লুপগেট', 'রুথলেস' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, মোদীর কর্মধারা সম্পর্কে কোনো কথাই আর সংসদে বলতে দেওয়া হবে না। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে ততই মোদীকে

এর পর ৭ পাতায়

ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের ন্যাটো আবেদনের বিরোধিতায়

তুরস্ক : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তায়িপ এরদোগান ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনের ন্যাটো সদস্যপদের আবেদন খারিজ করার জন্য সওয়াল করেছেন। সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া এবং আশ্রয় দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের পর সম্প্রতি সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছে।

ইতিমধ্যেই এরদোগান বিষয়টি নিয়ে নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ব্রিটেনের সঙ্গেও এরদোগান কথা বলবেন। প্রেসিডেন্ট এরদোগানের অভিযোগ সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড জঙ্গিবাদী দল কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির লোকজনদের আশ্রয় দান এবং নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করেছে। ইদানীং একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন জার্মানী, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং ফ্রান্সে খুবই সক্রিয়।

সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধিরা আঙ্কারায় এসে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রেসিডেন্ট জঙ্গিবাদীদের তুরস্কে ফেরৎ না পাঠানো পর্যন্ত কোনোরকম আলোচনায় ইচ্ছুক নন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

CPEC-র পরিধি সম্প্রসারণের পরামর্শ

সদ্য নিযুক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিপুল সম্ভাবনাময় চিন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (CPEC) তুরস্ক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ পাক প্রধানমন্ত্রী CPEC -কে দুই দেশের পরিবর্তে ত্রিদেশীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এমনটি বাস্তবায়িত হলে চিন পাকিস্তান এবং তুরস্ক তিন দেশই বিপুল সম্ভাবনার এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারবে।

CPEC বাস্তবায়িত হলে চিন-পাকিস্তানের বিপুল পরিমাণে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে। কারাকোরাম গিরিপথ থেকে বালুচিস্তানের গদর পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ফলে উপকৃত হবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি। ৬০ বিলিয়ন ডলারের CPEC প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নের সাথে পাকিস্তানের শক্তির চাহিদা পূরণে াহায্য করবে।

পাকিস্তানে অতি বর্ষণে মানুষ বিপন্ন

কিছুকাল আগেও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষ করে, উত্তর ও মধ্য পাকিস্তান খরার প্রকোপে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ মনে করেছিলেন যে, ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পাকিস্তানের বহু অংশ খরা কবলিত হবার ফলে গম উৎপাদন বিশেষ ক্ষতির মুখে পড়বে। আশঙ্কা এমন কিছু অবাস্তব ছিল না।

ইদানিং পাকিস্তানের অন্ততপক্ষে দুটি রাজ্যে যথা, বালোচিস্তান এবং সিন্ধ-এ খরার পরিবর্তে প্রবল বর্ষণে মানুষের জীবন বিপর্যয়ের মুখে। ইতিমধ্যে কমপক্ষে ১৭০ জন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের প্রবল বর্ষণে ত্রস্ত মানুষের সংখ্যার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। শুধুমাত্র বালোচিস্তান এবং সিন্ধ প্রদেশেই মৃতের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এভাবে বর্ষণ অবিরাম চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়বে।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে, বিগত ত্রিশ বছরে এমন ভারি বর্ষণ হয়নি। এমনভাবে দিনের পর দিন ব্যাপক অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে নি। অতি বৃষ্টিতে বহু এলাকা জলের নীচে চলে যাবার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জনগণকে সাবধান করে সতর্কবার্তাও জারি করেছে।

কলম্বিয়ার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি

লাতিন আমেরিকা কিংব দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে অবস্থিত কলম্বিয়া। নোবেল পুরস্কার জয়ী গর্সিয়া মার্কেজের দেশ। তাঁর অনন্য সাহিত্য রচনায় কলম্বিয়ার বিষয় বারবারই ঘুরে ফিরে এসেছে। এই দেশটি দীর্ঘ বহুকাল জুড়ে ড্রাগ মাফিয়া বা চোরাচালানকারীদের বিচরণ ভূমি বলে দুর্নাম কুড়িয়ে চলেছে। নারী পাচার এবং তা নিয়ে রাজধানী বোগোতা এবং অন্যত্র দুষ্কৃতীদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি চলতেই থাকে। শাসনক্ষমতা দীর্ঘকাল যাবৎ অতি দক্ষিণপন্থীদের কব্জায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখেই সেই সরকারগুলি চলতে অভ্যস্ত। বামপন্থী গণতান্ত্রিক বোধে প্রাণিত মানুষের সংখ্যা যাই হোক্, অতীতে অনেক সময় বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করতে ড্রাগ মাফিয়াদের সহায়তায় একাধিক খুনোখুনিও হয়েছে।

গত ১৯ জুন নানা ধরনের জটিলতা ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে বামপন্থী প্রার্থী কলম্বিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বামপন্থী বিদ্রোহী নেতা গুস্তাভো পেত্রো। তাঁর সঙ্গেই উপরাষ্ট্রপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন ফানসিয়া মার্কেজ। তাঁদের যৌথ নেতৃত্বে কলম্বিয়ার মতো দেশে নতুন ইতিহাস গড়ে তোলার কাজ চলতে শুরু করেছে। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলি যেমন, পেরু, চিলি, বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, আরজেনটিনার রাষ্ট্রপ্রধানরা একযোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আরও ব্যাপ্ত করার শপথ নিচ্ছেন। তাঁদের কাছে কলম্বিয়ার এই জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অমরনাথ যাত্রায় পর্বতপ্রমাণ প্রাকৃতিক বাধা

কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার একাংশে প্রচুর বরফ জমে একটি গুহায় হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীদের শিবলিঙ্গের আকৃতির সন্ধান মেলে। অমরনাথ গুহা এজন্য বিখ্যাত। পহেলগাঁও থেকে দীর্ঘ বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে পুণ্যার্থীরা যান অমরনাথ দর্শনে। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষ তীর্থ করতে যান। অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই যাত্রা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়ে চলেছে।

গত কয়েকদিন আগে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে বহুসংখ্যক পুণ্যার্থীদের অস্থায়ী তাঁবুগুলির অনেককটি ভেসে গেছে। বহু মানুষ নিখোঁজ। পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণী কৃতী ছাত্রী বর্ষা মুহুরি তাঁর মাকে অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিহত হলেন। দুঃখবহ ঘটনা।

বিপর্যস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ

বিশ্বের নানা দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আগ্রাসী পুঁজির অপরিমেয় লোভ লালসা পূরণ করতে প্রাকৃতিক পরিবেশের আতঙ্কজনক ক্ষতি হয়েই চলেছে। অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ কলকারখানার ধোঁয়া এবং বর্জ স্বাভাবিক মানব জীবনের কাছে এক ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ। নতুন নতুন অজানা রোগের ব্যাপ্তি ঘটে সাধারণ মানুষের জীবন জটিল সমস্যায়। পরিবেশগত ক্ষতির বিচারে ভারতের অবস্থান বিশ্বের নানা দেশের মধ্যে একেবারে নিম্নসারিতে। বলতে গেলে ভারতে বায়ুদূষণ সমস্ত মাত্রা অতিক্রম করে এক বিভীষিকায় পরিণত।

দিল্লি, কলকাতা প্রভৃতি বড় শহর সহ ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে শুধুমাত্র বায়ু দূষণের কুপ্রভাবেই মানুষের গড় আয়ু নিদারুণভাবে কমে যাচ্ছে। ভারত সরকার এ প্রসঙ্গে প্রায় উপযোগহীন নীরবতা অবলম্বন করে কালক্ষেপ করছে। বলতে গেলে বর্তমান ভারত সরকার অন্যান্য বহু জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে যেমন লিপ্ত রয়েছে, তেমনই বায়ুদূষণের মাত্র কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও অপরাধমূলক নীরবতা বজায় রেখেছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনগুলিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চটকদারী বক্তৃতা করলেও দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উদাসীন। তাঁর বা তাঁদের কাছে পুঁজির অবাধ বিকাশই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

ভারতের আদমশুমারি অথৈ জলে

সুদূর ১৮৭২ সাল থেকে প্রতি দশ বছর ব্যবধানে ভারতের জনগণনা করা হয়। ২০২১ সালে এদেশে এই অতিগুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচিটি পালিত হবার কথা ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই এদেশে জনগণনার কাজ হয়ে এসেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সংগঠিত করার দায়িত্ব দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। মহা ক্ষমতাশালী উগ্র আর এস এস প্রচারক অমিত শাহ ২০১৯ থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এইকাজে ব্যর্থ হল তাঁর পরিচালনাধীন মন্ত্রক। ২০২১ পেরিয়ে ২০২২ সালও প্রায় শেষ হতে চলেছে। তা সত্ত্বেও ভারত সরকারের কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল দাবি করে আসছে যে, জনগণনার ক্ষেত্রে জাতিগত বিন্যাস নির্ণয় করা প্রয়োজন। এটা হলে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে বা কমছে তা বিলক্ষণ বোঝা যাবে। ভারতের নানা প্রান্তে সংঘপরিবার যে উগ্রতার সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে যাচ্ছে বলে প্রচার করছে তার বাস্তব সত্যতা কি আছে বা নেই তা বুঝতে গেলে জাতিগত গণনা জরুরি।

আগামী ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। দেশের যে করুণ দশা মোদী সরকার করেছে তাতে ব্যাপক মিথ্যা প্রচার ও জাতিগত দাঙ্গা না বাঁধাতে পারলে বিজেপি'র পক্ষে ক্ষমতায় ফিরে আসা বাস্তবে অসম্ভব। সম্ভবত সে কারণেই সরকার জনসংখ্যার অনুপাত সম্পর্কে যথার্থ সত্য প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। আদমশুমারি হয়তো সে কারণেই বন্ধ রাখা হয়েছে।

বনাধিকার আইন সংশোধন করে আদিবাসী উচ্ছেদের ব্যবস্থা

আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করে আদিবাসী দরদী সাজছে বিজেপি। অথচ আদিবাসী-মূলবাসীদের উচ্ছেদ করে কর্পোরেট লুঠের পথ আরও সুগম করতে সংশোধিত হল বনাধিকার আইন। ২০১৪ সাল থেকে দেশজুড়ে চলছে দলিত, আদিবাসী- মূলবাসীদের ওপর অত্যাচার। যে ভীমা-কোরেগাঁও-র অনগ্রসর জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য ড. বি আর আম্বেদকর লড়াই করেছিলেন, সেই জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য লড়াই এখন দেশদ্রোহিতা। ভীমা-কোরেগাঁওর ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের কারাবন্দী করা হয়। আদিবাসীদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা ফাদার স্ট্যান স্বামীকে কারাগারে হত্যা করা হয়।

কর্পোরেটদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার সুযোগ দিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে বিজেপি সরকার। বামেদের দাবি অনুসারে ২০০৬ সালে ইউ পি এ সরকার বনাধিকার আইন প্রণয়ন করে। মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেই এই আইনটিকে লঘু করার চেষ্টা শুরু করে। বিজেপি যদি সত্যিই আদিবাসী দরদী হত, তা হলে এই আইন কার্যকরী করতে সচেষ্ট হত। এবারে বনাধিকার আইন সংশোধন করে, তাকেই গুরুত্বহীন করা হল।

আইন অনুসারে গ্রামসভার অনুমোদন ছাড়া বনাঞ্চল নেওয়া যেত না। উড়িষ্যার নিয়ামগিরিতে গ্রামসভার মাধ্যমেই আদিবাসীরা বেদান্ত গোষ্ঠীকে রুখে দিয়েছিলেন। পাহাড়, জঙ্গল, জমি, খনির কর্পোরেট লুঠে গ্রামসভা প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করেছে। তাই এখন গ্রামসভার অনুমোদন ছাড়াও বনাঞ্চল দখলের সুযোগ করে দিতে সংশোধিত হল আইন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারের চমকের মাঝেই আদিবাসীদের জন্য চূড়ান্ত সর্বনাশা নীতি নিল মোদি সরকার। আদিবাসী দরদী সাজার এই প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই শিবসেনা, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, উড়িষ্যার বিজেডি-বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করেছে। প্রচ্ছন্ন সমর্থনের সুর শোনা যাচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখে। উন্নয়নের নামে আদিবাসী উচ্ছেদে এরা কেউ বিজেপির থেকে কম যায় না। ঝাড়খন্ডে সরকার বদলালেও আদিবাসী উচ্ছেদের কর্মসূচি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্পোরেট সেবায় এতটুকুও ঘাটতি রাখছে না। উড়িষ্যায় বিজেডি সরকারের আদিবাসী উচ্ছেদের কথা সকলেই জানেন। পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল সরকার একই কাজ করছে। দেউচা পাচামীতে কয়লাখনির জন্য আদিবাসীদের বলপূর্বক উচ্ছেদে সরকার মরিয়া। গ্রামসভার মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বাইরে থেকে লোক এনে গ্রামসভার বৈঠককে ভন্ডুল করতে চেয়েছে। পুরুলিয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে পাহাড় বিক্রি করছে। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আদানির মতো গোষ্ঠীগুলিকে দিতে চাইছে। এই দলগুলি কর্পোরেট দালালি করতে বিজেপি'র মতোই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি আর আদিবাসীদের উচ্ছেদ—এই কর্পোরেট নকশার শরিক হয়েছে। বিজেপি, শিবসেনা, ঝাড়খন্ড মোর্চা, তৃণমূল। একেই বলে কর্পোরেটতন্ত্র।

শ্রীহীন দ্বীপরাষ্ট্রে লঙ্কাকান্ড

মনোজ ভট্টাচার্য

ভারতের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। ওই দেশের সাধারণ জনজীবন বিপন্ন। পরিপূর্ণভাবে এক অসহায় বাস্তবতার মুখোমুখি সকলেই। গত প্রায় মাসাধিক কাল যাবৎ মানুষ তাঁদের ক্ষোভের কথা, তাঁদের অসহায়ত্বের বিষয় শাসকদের কাছে পেশ করার অদম্য চেষ্টা করে গেছেন। দেশটির প্রায় সর্বত্র বিক্ষুব্ধ মানুষের আর্তরব শোনা যাচ্ছিল। খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, জ্বালানি তেল অসংকুলান, সমস্ত নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া এবং সরকারের তহবিল শূন্য। সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষ আর্তনাদ করে চলেছেন। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের কর্ণকুহরে এসব আদৌ প্রবেশ করেনি। অতিগুরুত্বপূর্ণ এইসব বিষয় কোনও তাৎপর্যজনক প্রসঙ্গ বলে প্রতিভাত হয়নি। রাষ্ট্রীয় সরকার গতানুগতিকভাবে আন্তর্জাতিক ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছে আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় কালক্ষেপ করে গেছে। দেউলিয়া অর্থনীতির সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবহনকারী কোনও ঋণদানকারী সংস্থা যে নতুন করে দাদন দেবার ব্যবস্থা করবে না, এই সরল বিষয়টি রাজাপক্ষ সরকারের বোধের অগম্য।

অর্থনৈতিক প্রশাসন নিয়ে অপরিপক্ক ছেলেখেলা করে গেছে। আন্তর্জাতিক পুঁজির সংকট সম্পর্কেও একান্ত অর্বাচীন বোধে লিপ্ত থেকে কোনও সদর্থক পদক্ষেপই করেনি।

শ্রীলঙ্কার বর্তমান ব্যাপক বা সর্বব্যাপী সংকট একদিন, একমাস বা এক বছরেই হয়নি। চলতি হিসাব বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা এক অর্থে 'ব্যালান্স অফ পেমেন্ট'-এর দুর্দশা বেশ কিছুকাল যাবৎ শাসক কুলের অবিমৃশ্যকারি সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই পরিগণিত হয়। বর্তমান সময়ে কারেন্ট অ্যাকাউন্টটি অবশ্যই বাকি বিশ্বের নানা দেশের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার আদান-প্রদান নির্ভর হিসাব। বিশেষ করে পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে এর সর্বমোট বাণিজ্য, আন্তরসীমা বিনিয়োগে এর মোট আয় এবং মোট বিনিময় বা ট্রান্সফার পেমেন্ট একটি পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকে। যে কোনও একটি দেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স ধনাত্মক বা নেতিবাচক বা সমান হবে কিন্তু তার মূলধনী অ্যাকাউন্ট ব্যালান্সের বিপরীত। বিশ্ব অর্থনীতির প্রাথমিক নিয়ম বা বিধিগুলি পূর্ণত উপেক্ষা করে এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আই এম এফ, প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে দেদার ঋণ নিয়ে যেমন ভাবে তেমন ভাবে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে জনমনোরঞ্জনকারী অর্থনীতি অনুসরণ করে গেছে শ্রীলঙ্কার উপর্যুপরি সরকার। এমনকি, চিন, জাপান সহ অন্যান্য উন্নত দেশ থেকেও শর্তসাপেক্ষে ঋণের ব্যবস্থা করেছে বলে জানা যায়। সেগুলি সম্মিলিতভাবে এক অনতিক্রম্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

এদেশের সব কিছুই তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে দীর্ণ। গত ৯ জুলাই শনিবার শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বলা চলে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিদ্রোহ একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে এই দিনে। অগণিত মানুষ যে যেমনভাবে পেরেছেন রাজধানী কলম্বোর পথে। জ্বালানি তেলের দাম লাগামহীন। ফলে অনেক মানুষই নিজস্ব যানবাহনে আসতে পারেননি। ট্রেনে বা বাসে এমনকি, বাসের ছাদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কলম্বো এসে পৌঁছেছেন। হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটেও পৌঁছে গেছেন। এক বিরল দৃশ্য। জনতার বিশৃঙ্খলা নয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের বিদ্রোহী রূপ লক্ষ করে স্তম্ভিত হতে হয়। কতটা হতাশা এবং রাষ্ট্রের শাসকদের প্রতি কী মাত্রায় চরম ঘৃণা থাকলে মানুষ এমন আচরণ করতে পারেন তা ভাবলেও শিহরিত হতে হয়।

বিক্ষুব্ধ মানুষ সরাসরি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল করে ফেলেছেন। নিরাপত্তারক্ষীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে স্তব্ধ হয়ে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই বিপুল জনসমাগমকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। কলম্বোর রাজপথে কোথাও কোথাও অবশ্য পুলিশের সঙ্গে মানুষের সংঘাত হয়নি, এমন নয়। দু একটি ক্ষেত্রে কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগও হয়েছে। কিন্তু, মোটের ওপর এমন বিপুল সংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী দেখায়নি। দেশের প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজপক্ষ রাতারাতি পালিয়ে বাঁচার চেষ্টায় হয়তো বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন কিংবা সেনাবাহিনীর কোনও অজানা ছাউনিতে আত্মগোপন করেছেন।

ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনকালে রাষ্ট্রপতির বাসস্থান হিসেবে বিশাল ও সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদ পুরোপুরি বিদ্রোহী মানুষদের দখলে চলে গেছে। নারী পুরুষ শিশু সন্তানসহ প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়েছেন। তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন যে, দেশের সমস্ত মানুষ যখন চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতায় দিবানিশি সন্ত্রস্ত তখন, গোতাবায়া কিভাবে এমন বিলাসবহুল প্রাসাদে থাকতে পারেন! দীর্ঘ বহুদিন যাবৎ মানুষ চিৎকার করে চলেছেন 'গো গোতাবায়া গো'। প্রেসিডেন্ট-এর পদত্যাগ দাবি করে মানুষের মিছিলগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। গোতাবায়ার বড় ভাই মাহিন্দা রাজপক্ষ এই দ্বীপরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে চরম যথেচ্ছাচার করেছেন। এবারে আবার সেই স্বেচ্ছাচারী মানুষটিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেছিলেন। সাধারণ মানুষের চরম ক্ষোভের আঁচ পেয়ে তিনি বাধ্য হয়েছেন পদত্যাগ করে আত্মগোপন করতে। এই মানুষটিকে সামনে পেলে হয়তোবা বিক্ষোভকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ পদপিষ্ট করেই মেরে ফেলত। তাঁর ভাই গোতাবায়া যে কোন মূল্যে অন্তত পক্ষে পারিবারিক শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে নির্লজ্জের মতো ক্ষমতা আঁকড়ে বসে আছেন। তিনি বা তাঁরা এতটাই জনবিচ্ছিন্ন যে, সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাও বুঝতে অক্ষম। স্বৈরাচারী শাসকদের এমনই মতিগতি। সব দেশেই এ অভিজ্ঞতা ইতিহাসের পাতায় বিধৃত রয়েছে।

বর্তমান শ্রীলঙ্কার আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে অবশ্যই এক কঠিন নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বাস্তবে জনগণ ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বিলাসবহুল প্রাসাদ দখল করেই সন্তুষ্ট বলে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে। রাজাপক্ষদের শ্রীলঙ্কা পেদুজনা পেরামুনা একান্তভাবেই পারিবারিক ব্যবস্থা।

বর্তমানে ধিক্কৃত ও আত্মগোপন করা রাষ্ট্রপতি নন্দসেনা গোতাবায়া রাজাপক্ষ তাঁর পেশাজীবনে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ৮৯ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় জনতা বিমুক্তি পেরুমনার নেতৃত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টার নামে এক ভয়ঙ্কর জাতিবাদী গৃহযুদ্ধের অবতারণা হয়েছিল। এই সংঘাতময় পরিস্থিতি দমন করতে শ্রীলঙ্কা সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে বহু সহস্র মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। বহু সংখ্যক মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করে বিদ্রোহ দমনে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় সরকার তৎপর ছিল। রক্তপিচ্ছিল হয়েছিল শ্রীলঙ্কার মৃত্তিকা। গোতাবায়া রাজাপক্ষ এক সেনা আধিকারিক হিসেবে বিশেষ দক্ষতা ও নৃশংসতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমনে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনতা বিমুক্তি পেরুমনার অন্যতম প্রধান নেতা রোহন বিজয়বীরা একদা ট্রটস্কিপন্থী হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই একই ব্যক্তি সাম্যবাদী দর্শনের মর্মবস্তু বিস্মৃত হয়ে উগ্র সিনহালা জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়েছিলেন। তিনিও উল্লিখিত গৃহযুদ্ধে নিহত হন। গোতাবায়া সেনাবাহিনীর পেশা থেকে অবসর নিয়ে বেশ কিছুকাল মার্কিন মুলুকে চাকরি করেছেন। সেই দেশের নাগরিকত্বও নাকি নিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালে শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে ও দেশের উত্তর ও পূর্বাংশে যে বহু লক্ষ তামিলভাষী অধিবাসী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পূর্বাপর সরকারগুলি কমবেশি অত্যাচারী ভূমিকা নিয়েছিল। তামিল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষরা ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাগিচা শ্রমিক হিসেবে একান্ত সন্নিহিত দ্বীপরাষ্ট্রে বসবাস করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা পরিকল্পনামাফিক এই সব তামিল শ্রমিকদের বাগিচা শিল্পে নিয়োগ করেছিল। মূল শ্রীলঙ্কাবাসী অধ্যুষিত দ্বীপে উগ্র সিনহালা জাতীয়তাবাদ ক্রমশই তামিল জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হরণ করতে থাকে। এক সময়ে উগ্র তামিল জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ মদতে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে এল টি টি ই নামে তামিল জাতীয়তাবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৩ সালে জাফনা অঞ্চলে এক প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘাতের ঘটনায় তাদের পরিচিতি প্রকাশ্যে আসে। তার আগেই অবশ্য জাফনার মেয়র এবং সংসদ সদস্য শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির নেতা অ্যালফ্রেড দুরাইপ্পা ২৭ জুলাই ১৯৭৫ জঙ্গি তামিল উগ্রবাদের শিকারে পরিণত হন। তিনিই সম্ভবত শ্রীলঙ্কার প্রথম রাজনৈতিক কারণে নিহত শহিদ হিসেবে দ্বীপরাষ্ট্রের ইতিহাসে উল্লিখিত।

ওই দেশে তামিল জঙ্গি সংগঠনের বহুবিধ অপকীর্তি সম্পর্কে কমবেশি অনেকেই অবহিত। আবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উগ্র সিনহালা জনগোষ্ঠীর চরম অসহিষ্ণুতার প্রসার। সিনহালা ভাষাকে ওই রাষ্ট্রে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্মকে একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের সরকার ক্রমাগত হিংসা ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিকারী উদ্দাম সাম্প্রদায়িক আচরণগুলিকে মান্যতা দিয়ে চলে। রাষ্ট্রিক প্রশাসন পরিলাচনায় ইংরাজদের থেকে শেখা 'divide and rule' অর্থাৎ বিভাজন কর এবং শাসন করো নীতি নিয়েই চলতে থাকে শ্রীলঙ্কার সরকারগুলি। আবার এই একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে তামিল জাতীয়তাবাদী জঙ্গি সংগঠন উত্তরপূর্ব শ্রীলঙ্কায় পৃথক ও স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গড়ে তোলার নামে চরম হিংস্র আচরণে প্রবৃত্ত হয়। নানা দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ইলম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলির সম্মানজনক সমাধানের কোনও উদ্যোগ না থাকায় ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের মতো অতি উগ্র এক ব্যক্তিত্ব তামিল জনগোষ্ঠীর মুক্তিদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর খেয়ালখুশি অনুযায়ী একক নেতৃত্বে প্রত্যয়শীল এক স্বৈরতন্ত্রী হিসেবেই তামিল জাতীয়তাবাদের অভীষ্ট সাধনে মুখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক যাবৎ রক্তপ্লাবী গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এই গৃহযুদ্ধে সংযুক্ত জাতীয় পার্টি (UNP) নেতা ও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রণসিংঘে প্রেমদাসা এল টি টি ই'র আত্মঘাতী বোমায় নিহত হন। ১ মে ১৯৯৩ রাজধানী শহর কলম্বোয় এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার আগেই অবশ্য ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী ১৯৯১ সালের ৩১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমপুদুরে একটি নির্বাচনী সভাস্থলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। অভিযোগ এল টি টি ই প্রেরিত আত্মঘাতী জঙ্গিদের বিরুদ্ধেই।

শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের আবহে ভারত সরকারের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তা এল টি টি ই'র মোটেই পছন্দ ছিল না। তারা ভারতের শান্তিরক্ষা বাহিনীর উপস্থিতিও মেনে নেয়নি। এই দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত সশস্ত্র সংঘাতে বহু সহস্র মানুষের জীবনাবসান ঘটে। শ্রীলঙ্কার অন্যান্য অংশে উগ্র সিনহালা জাতীয়তাও ক্রমে ক্রমে অপরিমেয় জনপ্রিয়তা পায়। বৌদ্ধ সাধুদের হিংস্র রূপ বারেবারেই প্রকট হয়ে ওঠে।

গৌতম বুদ্ধের বিশ্বশান্তি ও ধর্মীয় হানাহানির বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার দর্শন পদদলিত হয়ে চলে এই দ্বীপ রাষ্ট্রে। যথার্থই শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়ে পড়ে।

জয়বর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁরই দলের নেতা রণসিংঘে প্রেমদাসা রাষ্ট্রপতিপদে ব্রতী হন। তিনি বেশ কিছুকাল জয়বর্ধনে মন্ত্রীসভার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সময়কালে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বকালেও শ্রীলঙ্কার শাসকদের মুখ্য শাসনপ্রণালী ছিল উগ্র সাম্প্রদায়িকতার অপার প্রসারভিত্তিক। ইউ এন পি দল হিসেবেও উগ্র ধর্মান্ধ বৌদ্ধজাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় দিয়েই চলে।

বর্তমান কালে শ্রীলঙ্কার গণবিদ্রোহের মূল সন্ধান করতে হলে ওই রাষ্ট্রের শাসকদের অনৈতিকতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পক্ষাবলম্বন প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে অনুভব করতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সমদর্শী না হয়ে যদি ক্রমাগত সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর ধর্মীয় উন্মাদনা ও জঙ্গি আচরণ উস্‌কে দিয়েই চলে তা হলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এমনই হয়। বর্তমান ভারত সরকারকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মোদী সরকার যদি এ থেকেও যথার্থ শিক্ষাগ্রহণ করে তাদের অনুসৃত অনৈতিক পথ পরিহার না করে তা হলে, ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষেও আরও ঘোর দুর্দিন অপেক্ষা করছে। লক্ষ করলেই বোঝা সম্ভব যে ভারতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এক চূড়ান্ত সমস্যায় পরিণত।

প্রথম থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ চলা তামিল জনগোষ্ঠীকে সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করে পরম নিশ্চিন্তে প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি এবং জনস্বার্থবিরোধী অর্থনীতি অনুসরণ করে চলেছে শ্রীলঙ্কা সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকাল থেকে যাঁরাই রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা সকলেই কমবেশি এই অনৈতিক পথই অবলম্বন করে গেছেন। সুদূর ১৯৫৫ সাল থেকেই প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অসহিষ্ণুতা এবং ঘৃণাযুক্ত হিংসার প্রসার জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। প্রথম দিক থেকে তামিল বিরোধিতা ও ২০০৯ সালের ১৮ই মে প্রবল যুদ্ধে উগ্রপন্থী তামিল নেতা প্রভাকরণের

এর পর ৮-এর পাতায়

গোসাবা ও বাসন্তীতে লাগাতার আর এস পি'র কর্মসূচি.....

রাজ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা শিক্ষাক্ষেত্র সহ সর্বত্র এবং একদল দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা সহ পুলিশ ও একদঙ্গল লুম্পেন তৃণমূল কর্মীদের আধিপত্যে সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ও কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার পথসভা ও বিডিওদের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা আর এস পি'র জেলা নেতৃত্ব। বিগত এক মাস ধরে এই কর্মসূচি চলছে এলাকার বিভিন্ন হাট, বাজার ও গঞ্জ এলাকায়। ২০১১ পরবর্তী সময়ে শাসক দল তৃণমূলের ব্যাপক সন্ত্রাস, দলীয় কর্মীদের ওপর ভয়ভীতি নির্যাতন, ব্যবসা বন্ধ করা, জমিতে ফ্ল্যাগ পুঁতে দখলদারি করা, পুকুরে বিষ দেওয়ার মতো ঘটনায় কর্মীরা সন্ত্রস্ত ছিল। কিন্তু ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত স্বজনপোষণ, ব্যাপক কর্মহীনতা ও সন্ত্রাস মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। তাই মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে গোসাবা-বাসন্তীতে সংগ্রামী ঐতিহ্যের ভূমিকায় পুনরায় বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে আর এস পি। ভয়ভীতি উপেক্ষা করে এলাকার খেটে খাওয়া মানুষ এই সমস্ত সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

গোসাবা, লাক্সবাগান, সাতজেলিয়া, মোল্লাখালি, বেলতলিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বাসন্তী, সোনাখালি, শিবগঞ্জ, নফরগঞ্জ ও উত্তর মোকামবেড়িয়াতেও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন কম. সুভাষ নস্কর, কম. চন্দ্রশেখর দেবনাথ, কম. রাজীব ব্যানার্জী, কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা, কম. আদিত্য জোতদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই সভাগুলো শেষে গোসাবা ও বাসন্তীতে বিডিওদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় স্ব স্ব বিডিও অফিসে। প্রতিটি সভা ও ডেপুটেশন দেওয়া উপলক্ষে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব এস এস সি ও প্রাইমারিতে নিয়োগে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নিয়ে সরকারকে তুলোধোনা করেন এবং দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সকলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগের দাবি জানান। রাজ্য জুড়ে একের পর এক সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও জানান তাঁরা। এছাড়াও সংঘ পরিবার শাসিত বিজেপির নেতৃত্বে এন ডি এ জমানায় কেন্দ্র সরকারের আমলে যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন নেতৃত্ব। তাঁরা বলেন বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করেছে, এই সরকার মানুষের দুহাতে কাজ দিতে পারছে না অথচ প্রতিদিন কাজ কেড়ে নিচ্ছে এরা। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে দেশটাকে। আবার অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ পেট্রোল, ডিজেলের দাম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়ছে। এই মানুষকে নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। এই দীর্ঘ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল 'সুন্দরবন বাঁচাও'। এক সময় সুন্দরবন বাঁচাও আন্দোলন করে গোসাবা-বাসন্তীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন কম. মিহির দেবনাথ, বলরাম বেরা, অশোক চৌধুরী, গজেন মাইতি, অরিন্দম নাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বর্তমানে সুন্দরবনের নদীচর দখল করে তা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে স্থানীয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। প্রতিদিন ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে সমানভাবে, নদীচর দখলের সাথে সাথে সেখানে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন চলছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সুন্দরবনবাসীর কাছে সমূহ বিপদ। জেসিপি মেসিন দিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে সাধারণ মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি করছে তৃণমূলের নেতারা, বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আর বাঁধ হচ্ছে ভঙ্গুর অশক্ত। ফলে এখানকার মানুষের সামনে সমূহ বিপদ। আর এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন পার্টির নেতৃত্ব এবং ব্যাপক আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সিভিক ভলান্টিয়ার, রাজ্যে দুর্নীতি ও অপরাধের রক্ষাকবচ

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে দুর্বৃত্ততন্ত্র যে অনুগ্রহপ্রাপ্ত গোষ্ঠীদের সর্বব্যাপী জাল বিস্তার করেছে তা সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে পুলিশ বিভাগের মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিভাগের পিরামিডের শীর্ষ থেকে ভূমি পর্যন্ত নেমে এসে সমস্ত অন্যায় ও অবৈধ তথা নাগরিক অধিকার হরণের কাজগুলি অনৈতিকভাবে ন্যায্যতা পাচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ার নামক অস্থায়ী কর্মীদের কাজকর্মে। সম্প্রতি সকারের শীর্ষস্তরের আমলা সহ রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল শুধু নয়, বিভিন্ন তদন্তে যুক্ত সিবিআই অফিসাররাও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিষয়সমূহ আদালতে ও জনসমক্ষে স্বীকার করেছেন। আনিস খানের মৃত্যুর তদন্তে সিটের রিপোর্টে শুধু নয়, নবনির্বাচিত দুজন কাউন্সিলারের খুন থেকে শুরু করে ভাদু শেখের খুন এবং সেই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধে নারী শিশু সহ এগারো জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায়ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আনিসের খুনের মামলায় অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অন্য একটি প্রসঙ্গে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ ত্রিবেদীও প্রকাশ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের এভাবে বহাল করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না দিয়েই প্রশাসনের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ করানোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

শীর্ষস্তরের আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের তরফ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের প্রথম বছরেই হাওড়া কমিশারিয়েটে সূত্রপাত হওয়া এই অস্থায়ী কর্মীদের বহালির প্রক্রিয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উঠছে বলেই, এর গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বাস্তবেই আগাপাস্তলা দুর্নীতির চোরাবালিতে ডুবে থাকা ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে প্রশাসনের টানাপড়েন এবং নাগরিক সমাজের উপর অগণতান্ত্রিক তথা অমানবিক ব্যবহার থেকে চোখ সরাতেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের উলুখাগড়া বা বলির পাঁঠা করা হচ্ছে।

পারস্পরিক ঘটনার সাপেক্ষে সেই সত্যটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে ছত্তিসগড়ে উগ্রপন্থী নকশাল বিদ্রোহ দমন করতে সালোয়া জুডুম এবং এস পি ও নামক অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া এবং স্থায়ী পদে বহাল না করার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালত কঠোরভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিন্দা করেছে। নিয়োগ বেআইনি করেছে। ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

ইদানীং শীর্ষ আদালত এবং কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ আদালত সংবিধানের গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। সেই প্রেক্ষিতে দেখতে গেলে রাজ্য সরকারের তড়িঘড়ি করে আর টি আই, মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতির বহুদিন ধরে শূন্য সবগুলো পূরণের ব্যস্ততা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের নিদর্শন স্পষ্ট।

ইতিহাসে এই ধরনের দুর্বৃত্ত নির্ভর অস্থায়ী সরকারি জঙ্গি বাহিনী গঠনের উদাহরণ দুর্লভ নয়। গণ আন্দোলনের ভাঁটার টানের সময়ে বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার জন্য সমাজের দুর্বৃত্তদের নিয়ে রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের ব্ল্যাক হান্ডরেড বা ফরাসীদেশে বোনাপার্টের শাসনকালে ন্যাশনাল গার্ডদের বাহিনী গঠনের মতো ইতিহাসের প্রহসন আমাদের দেশেও পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজ মুখর হয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে না তুললে এই প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমাজের গভীরে শেকড়ের জাল বিস্তার করবে। সেই আশঙ্কার ছায়াই দীর্ঘতর হচ্ছে রাজ্যে এবং সারা দেশে।

জ্বালানি শক্তি ও সংঘ পরিবারের রাজনীতি

২০১৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির বাজারগরম করা ইউ পি এ সরকার বিরোধী প্রচারের একটি মুখ্য বিষয় ছিল ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দাম। অথচ এই সাত আট বছরের মধ্যে জ্বালানির দামের ধাক্কায় সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। দেশি বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে এবং সরকারি কোষাগারের বিশাল ঘাটতি মেটাতে জনসাধারণের দুরবস্থার তোয়াক্কা না করে বেড়েই চলেছে জ্বালানির দাম। সেই ক্রমবর্ধমান দামের ধাক্কায় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে। এখন বোঝা যাচ্ছে 'আচ্ছে দিনে'র মতো জ্বালানির দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি শুধুই নির্বাচনী প্রচারে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার লক্ষে প্রচারিত হয়েছিল। না হলে মাত্র আট বছরের মধ্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় দেড় গুণের বেশি বৃদ্ধি হওয়ার পরেও মুখে কুলুপ এঁটেছে কেন মোদী সরকার। শুধু কুলুপই আঁটেনি। দেশবাসীকে চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার পাশাপাশি কর্পোরেট দুনিয়ার সেবাদাসের ভূমিকা নিয়েছে। আর রাষ্ট্রকে ক্রমশ সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাহকে পরিণত করছে। রকেটের গতিতে মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি অথচ চরম বেকারত্ব ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার বন্ধ্যা অর্থনীতির জালে আটকে আছে এই সরকার। কোভিড মহামারি আর অবিবেচক সরকারের লকডাউনে চাকরি হারিয়েছে কোটি কোটি মানুষ। এরই মাঝে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে গিয়ে সুদ বাড়ানোর বোঝা সাধারণ মানুষেরওপর চাপিয়ে দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। তাই জ্বালানির খরচ সামলাতে ঘরে ঘরে চাপ পড়বে দুধ আর ন্যূনতম পুষ্টি এবং সন্তানের পড়াশোনার খরচে।

কাউন্সিল ফর এনার্জি এনভায়োরনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার-এর সমীক্ষায় গ্রামের মানুষের জ্বালানির খরচ তিন বছরের মধ্যে মোট সাংসারিক খরচের ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকারের বহুবার ঢাক বাজানো উজলা প্রকল্প আজ শুধু প্রহসন।

গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজের সমীক্ষায় বাধ্য হয়ে উজলার গ্যাস ছেড়ে দিয়ে গোবরের ঘুঁটে, কাঠকুটো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সারা দেশে দূষণের জন্য মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁদের মধ্যে মেয়েরাই বেশি। আর যথারীতি এই চূড়ান্ত অনৈতিক হারে গ্যাসের দাম বাড়ার পাশপাশি ভর্তুকি বন্ধ করার ফলে বাড়ছে বৈষম্য গ্রামে ও শহরে, গরীব আর মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তে। এটাই বিজেপি'র আর্থরাজনীতি। এখনো মথুরা আছে, তাজমহল আছে, লালকেল্লা আছে, এন আর সি আছে। অনেক সংখ্যালঘু ও দলিত মানুষ সহ জাতপাত নির্বিশেষে গরিব মানুষ কোনো রকমে বেঁচেবর্তে আছে। আছে পাকিস্তান, আছে চিন। সুতরাং বিজেপি ও সংঘ পরিবারের দেশজুড়ে প্রতিক্রিয়ার জ্বালানি তো আছেই। রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজনে দাবানল নির্মাণ করা যাবে, এটাই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

বাইডেনের এশিয়া সফর

দক্ষিণ চিন সাগরে চিন সামরিক মহড়ায় ব্যস্ত। ঠিক এই সময়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান সফরে গেলেন। দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি মোকাবিলার লক্ষ্যেই বাইডেনের এই দূর প্রাচ্য সফর।

১৯ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত দক্ষিণ চিন সাগরে চিনের সামরিক মহড়া চলেছে। চিনের সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহড়া চলাকালীন নির্ধারিত অঞ্চলে বিমান বা জাহাজের প্রবেশ করা চলবেনা।

নির্ধারিত অঞ্চলে চিনের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো অবস্থান না নিলেও, চিন সমুদ্রে আমেরিকান জাহাজ চিনের সামুদ্রিক ঘাঁটির নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই প্ররোচনায় ইন্ধন জুগিয়েছে।

জাপান সফরের সময় জো বাইডেন ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনৈতিক মৈত্রী গোষ্ঠীর (QUAD) সদস্যবৃন্দ অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপানের নেতৃবৃন্দের সাথে চিনের আধিপত্য মোকাবিলার লক্ষ্যে আলোচনা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে চিন পুরানো দাবি তাইওয়ানকে মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। চিনের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে তাইওয়ানকে মদত দেওয়াটাও বাইডেনের এই সফরের একটি লক্ষ্য।

নদীয়া জেলার রাণাঘাটে সারা বাংলা অঙ্গনওয়ারী ও সহায়িকা কর্মী সমিতির ডেপুটেশন

আই সি ডি এস সেন্টারগুলিতে পানীয় জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা, বাজার দর অনুযায়ী ডিম, জ্বালানি, সবজির দাম, সহায়িকাদের পদোন্নতি, অঙ্গনওয়ারি সহায়িকা ও কর্মীদের সরকারি কর্মচারির মর্যাদা সহ অন্যান্য দাবিতে গত ২৯ জুন, ২০২২ বুধবার ইউ টি ইউ সি'র উদ্যোগে রাণাঘাট মহকুমা শাসক দফতরে মিছিল সহ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা অঙ্গনওয়ারি ও সহায়িকা কর্মী সমিতির কম. ভবানী বর্মন, কম. অঞ্জনা বিশ্বাস, কম. বন্দনা শর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা ভাবনা ও সাম্প্রতিক সমস্যা

হরিপদ বৈদ্য
(প্রাক্তন সদস্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পঃবঃ)

স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার করার পর সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের দুনিয়ায় অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও পুঁজিকে কত বেশি পরিমাণে মানব জাতির প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারা যায় এবং অজানা সব রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এর সবটাই নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর।

শিক্ষাকে কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শোষণ বঞ্চনা অন্যায় ও অবিচার-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত অবস্থার এক মূর্ত প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। একটি জাতি রাষ্ট্রের মূল চাবিকাঠি স্বরূপ প্রকৃত শিক্ষা শিশুদের অতি উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে তাকে মানব পর্যায়ে উন্নীত করে। সমাজ বিজ্ঞানীরা শিশুদের উত্তম নাগরিক করে গড়ে তুলতে চান যেখানে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, প্রত্যেকের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক একটা এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদের দেশে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বহুভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকটি কমিশন হয়েছে, শিক্ষা সম্পর্কে বহু মতামত এসেছে এবং তা শিক্ষাঙ্গনে উৎকৃষ্ট শিক্ষা চালুর ক্ষেত্রে প্রয়োগও হয়েছে। আখেরে শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে বহু গবেষণা, চর্চা, মূল্যায়ণ অদ্যাবধি ব্যবস্থার কতটা অগ্রগতি ও পরিবর্তন হয়েছে তা, আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত সময় বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

'কোঠারি কমিশন' শিশু শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে 'কমন স্কুল সিস্টেম' গড়ে তোলার সুপারিশ করেন। ৪০ জনের কম ছাত্র যুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে একত্রিত করে গুচ্ছ বিদ্যালয় ব্যবস্থা সেখানে উল্লেখ করা আছে। ফলতঃ দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির থেকে আসা শিক্ষার্থীরা সেক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। স্কুল ছুটের সংখ্যা (ড্রপ আউট) ও শিক্ষার অধিকার আইন খর্ব করা হবে।

১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হওয়ার পর নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫ নং ধারায় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ ছিল ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক সন্তোষজনক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) সম্পূর্ণ করতে হবে। সে কারণে বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি, শিক্ষকের ব্যবস্থা, পঠন পাঠনের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অন্তরায় হয়ে ওঠায় সাফল্য ব্যাহত হয়। সমীক্ষায় দেখা গেল সারা দেশের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ২০ কোটি শিশুর মধ্যেও ৫ কোটি ৯০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাহিরে থেকে গিয়েছে। এদের মধ্যে বালকের সংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ এবং বালিকার সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

আমাদের রাজ্যে ঘন বসতির ১ কি.মি. এর মধ্যে বহু গ্রাম এলাকাতে কোনো বিদ্যালয় নেই। ১৯৮৬ সালে ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি বা নয়া শিক্ষানীতি মূলত ব্ল্যাকবোর্ড অপারেশন ও কমপিউটার শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও তার সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে কোনো মূল্যায়ণ হয়নি। এর পরবর্তী ১৯৯৩ সালে শিশু শিক্ষার সামগ্রিক রিপোর্ট বিষয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে পি উন্নিকৃষ্ণন মামলার বিচারে নির্দেশ দেন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে ব্রত পালনের মতো রূপায়িত করার লক্ষ্যে সমন্বিত ও যথাযথ প্রয়াস নিতে হবে। অনুরূপ ভাবে ১৯৯৯ সালে প্রারম্ভিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি একই অঙ্গীকারের মাধ্যমে ফলশ্রুতি হিসেবে 'সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প' গ্রহণ করেন এবং প্রকল্পকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়। যেখানে বলা হয়েছে ১ কি.মি-র মধ্যে বিদ্যালয় তৈরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মিড-ডে-মিল (রান্না করা খাবার), উন্নত ও স্বচ্ছ বিদ্যালয় পরিবেশ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, খোলার মাঠ ও সরঞ্জাম, গ্রন্থাগার বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ ড্রপ আউট ছেলে মেয়েদের চিহ্নিত করে স্কুল ভর্তির ব্যবস্থা, আনন্দদায়ক পাঠদান, শিক্ষা বিষয়ে নিয়মিত নজরদারির প্রস্তুতি রেখে প্রতি মাসে অভিভাবক সভা, মাতা সভা বিবিধ। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সংশোধনী পাঠ (Remedial teaching) সঙ্গী শিক্ষণ (Peer learning) ব্যবস্থা চালু করা হয়।

প্রাথমিকে নিয়মিত নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ পদ্ধতি (CCE) বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। মেয়েদের জন্য চালু হল 'উদিতা প্রকল্প' (NPEGEL)। রাজ্য ও জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সর্বশিক্ষাকে সফল করার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে অভিমুখীকরণ কর্মশালা এবং বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে পূর্ণ প্রয়োগ অন্যতম দিক। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া হল। সকল শিশুদের জন্য নির্দেশে বলা হয়েছে ২০০২ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২০১০ এর মধ্যে ৩ বছরের ৮ম শ্রেণি শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে। এতদসত্ত্বেও সমীক্ষার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়—শিক্ষকদের মধ্যে প্রেরণার অভাব এবং বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের তদারকিতে ঘাটতি থাকায় সম্পূর্ণতা পায়নি।

২০০৯ সালে শিক্ষা অধিকার আইন (শিশুশিক্ষা) RTE Act বিনা বাধায় পার্লামেন্টে পাশ হয়। সকলের জন্য শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব দিকগুলিতে বেশি গুরুত্ব দিতে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে তার প্রয়োগ ও রূপায়ণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা জানার অধিকার নাগরিকদের অবশ্যই আছে। শিক্ষার গুণগত মান বিষয়ে প্রশ্ন নাগরিক সমাজকে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী করে তুলেছে।

কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, বাস্তবটা স্বীকার করে নিয়ে বলতে চাই বর্তমানে সরকারি ঔদাসীন্য ও খামখেয়ালীপনা শিক্ষাঙ্গনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি দলের হস্তক্ষেপ ও দখলদারিতে অভূতপূর্ব সংকট বিদ্যমান। সরকারি বিদ্যালয় ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন ভাবে দুর্বল করার কারণে ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি আলো ঝলমল শিক্ষালয়ের প্রতি অভিভাবক ও পড়ুয়াদের আকর্ষণ বাড়ছে। সরকার কৌশলে শিক্ষায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ গড়ার ভবিষ্যত লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাবে পঠন পাঠন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাধিক শূন্যপদ পড়ে আছে।

বেশি সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক ঘাটতি ছাত্র ছাত্রীদের প্রকট সমস্যা তৈরী করেছে। অনেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নিউ সেটআপ আপার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগ বন্ধ থাকায় পঠন পাঠন চালানো বর্তমানে দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী শিক্ষক নেই। সুন্দরবনে একাধিক ব্লক এলাকায় শিক্ষক ঘাটতি পড়ুয়াদের কাছে চরম ভোগান্তি ও উদ্বেগের। শিক্ষক ঘাটতি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দিক হল একটা বড় সংখ্যক শিক্ষক অবসর নিয়েছেন এবং অপর দিকটি হলো অনেকে উৎসশ্রী পোর্টালে আবেদন করে গ্রাম ছেড়ে বদলি নিয়ে নিজেদের বাসস্থানের নিকটস্থ বিদ্যালয়ে চলে গিয়েছেন।

বাম সরকারের সময় স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সাল থেকে বিগত ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ ব্যবস্থা চালু ছিল। যার ফলে শিক্ষক ঘাটতি তেমন ছিল না। তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। ২০১৬-২০১৭ এমনকি, ২০১৪ এ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এখনো তার পাট চোকেনি। প্রায় দু বছর হতে চলছে 'এস এস সি'র নিয়োগে দুর্নীতি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সফল পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত। কলকাতা মহামান্য উচ্চ আদালতের কয়েকটি বিশেষ রায়ের প্রেক্ষিতে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রসঙ্গত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত বাগ মহাশয়ের নেতৃত্বে কমিটির প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তার ভিত্তিতে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের দায়িত্ব সি বি আই-এর উপর অর্পণ করা হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতির জন্য হাজার হাজার যুবক যুবতী শিক্ষকের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা, অবশ্যই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। কর্তৃপক্ষের চোখে শিক্ষার কি অবস্থান, কতটা অবনমিত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সর্বশেষ আঘাত এসেছে কোভিড অতিমারিকালে, দু বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুল বন্ধ থাকায় অতিমারি দেখিয়ে বিশেষত বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চল অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে পঠন পাঠন সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পড়ুয়াদের সদিচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয়নি। অন লাইনে পাঠদান তাদের অনেকের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়। বর্তমানে বেসরকারি সমীক্ষায় বলা হয়েছে ২০১৪ এর তুলনায় ২০১৮ এবং ২০২১ প্রাথমিক স্তরে বাংলায় দেখে পড়তে পারে না শিশুদের সংখ্যা ৩২ শতাংশ। ২০১৪তে অষ্টম শ্রেণির ৬৮ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারত। ২০১৮তে শিশুদের ৩১ শতাংশ অক্ষর জ্ঞান ছিল না, এছাড়া ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গুণতে পারত না ২০ শতাংশ। ২০২২ এ তা ৩৫ শতাংশ হয়েছে। অনেক রাজ্যই তার ব্যতিক্রম নয়। এর থেকে বুঝে নিয়ে সব রাজ্যকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এরাজ্যে ফাঁকফোকর বন্ধ করতে সরকারী দপ্তরগুলিতে শূন্যপদে আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ঃ—

আমাদের দেশের সংবিধান মূলত গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির যে বয়ান তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে, শিক্ষায় 'গৈরিকীকরণ', ধর্ম ও সংস্কৃতি দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতের মতো গ্রাম ভিত্তিক পরিবেশে ডিজিটাল পদ্ধতি, অনলাইন, টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও মাধ্যমে শিক্ষাদান গ্রহণ ও রূপায়ণ করা কতটা সম্ভব তা সময় বলবে।

ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের ৫৪ মাস

ত্রিপুরাতে একাধারে প্রতিশ্রুতি আর ভাষণবাজি, অন্যদিকে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠনের সঙ্গে চলছে লাগামছাড়া দুর্বৃত্ততন্ত্র। এককথায় ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের ৫৪ মাস বলতে সেটাই বোঝায়। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে কোনো দাবিপূরণের জন্য পথে নামতে হবে না। এই ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি'র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। কোনো প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেনি এতদিনে। ৫৪ মাস পরে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলছেন, এবার বাকি ৬ মাসে তিনি নাকি সব করে দেখাবেন। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে একমাত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ডালপালা বিস্তার ছাড়া, তাদের সরকার কিছুই করে উঠতে পারেনি। শাসক দলের শীর্ষ নেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মাত্র।

সোজাসুজি এর অর্থ দাঁড়ায় ৩২ মাস শাসকদলের শীর্ষনেতা দলকে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ। এর মধ্যে মানিকের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিরোধী ফরমান, অর্থাৎ ঈদের উৎসবে কোরবানি বন্ধ করে দেওয়াতেই সরকারের হিন্দু সাম্প্রদায়িক কর্মসূচির অভিমুখ সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তরের অধিকর্তার নির্দেশ এই বিষয়ে সারা রাজ্যে এবং দেশে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সমস্ত জেলায় জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোরবানি বন্ধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ধর্মাচরণের সাংবিধানিক অধিকারের উপর জবরদস্তি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী সোচ্চার হয়েছে। নির্দেশনামায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রাণীকল্যাণ বোর্ডের' সচিবের চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে। কোন আইনে কেন্দ্রীয় প্রাণীসম্পদ দপ্তরের অধিকর্তা এই আদেশ জারি করেছেন? এ বিষয়ে শুধু ত্রিপুরাতে নয় সারা দেশের সংখ্যালঘু সমাজ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকায় হাইল্যান্ড পার্কে বন্দুকবাজের হামলা ও আমেরিকার ফ্যাসিবাদ

আমেরিকায় গত ৪ জুলাই স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ চলছে অন্যান্য মফস্বল এলাকার মতো হাইল্যান্ড পার্কেও। এমনসময় আচমকা একটি সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তরুণের হাতের বন্দুক থেকে অগ্নিবৃষ্টি, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো কয়েকজনের শরীর থেকে। লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন নিরীহ নাগরিক, যারা উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হতে চেয়েছিল।

এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। গত কয়েক মাসে প্রায় ২৩৩টি ক্ষেত্রে বন্দুকবাজদের হামলায় মানুষ নিহত বা আহত হয়েছেন। এক ভয়াবহ অবস্থা। স্যাভিছক, বাফালো, উভাল্ডে প্রভৃতি জায়গায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তপিপাসু এই খুনেরা কিশোর বা সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তরুণ। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নির্বিচারে খুন করতে যাদের হাত কাঁপে না। একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যায়, শুধু সংখ্যা বাড়ে হত্যাকান্ডের আর হতাহতদের। কিছুদিন পরে সাম্প্রতিকতম হত্যাকান্ডটির স্মৃতি মুছে যায়, আবার কোনো নতুন জায়গায় মানুষ লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন বন্দুকবাজ আততায়ীর গুলিতে।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন আইসম্যান তাঁর এক হাইল্যান্ড পার্কের বন্ধু সু কোয়ের কাছে জানতে পারেন, "আততায়ী ববি ক্রিমো খুব বেশি হলে ২০ বছরের তরুণ, শ্বেতাঙ্গ পরিবারের সন্তান। নিজের বেডরুমে দিনের প্রায় ২০ ঘণ্টা অনলাইনে শিকার ও হত্যার ভিডিও গেম খেলে। সর্বদাই উত্তেজিত থাকে। তাঁর মা ঠাকুমা তার জন্য সদা ব্যস্ত। তাঁর মেজাজের দায় মেটাতে রান্না করা, জামাকাপড় ঘরদোর গুছিয়ে রাখেন সদা সন্ত্রস্ত হয়ে। বন্ধুবান্ধব প্রায় নেই।" অধ্যাপক স্টিফেনের বক্তব্য যে তিনি আরো খবর নিয়ে জেনেছেন ছেলেটি ট্রাম্পের সমর্থক। হাইল্যান্ড পার্কের মতো ডেমোক্রাট সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের এলাকায় এ ধরনের ঘটনা সত্যিই বিরল।

ক্রিমোর ক্ষেত্রে অন্যান্য কিশোর বা হিংস্র আততায়ী তরুণদের মতো, ক্রিমো সিজোফ্রেনিক এবং ডিলুশ্যনাল ডিসঅর্ডার দ্বারা আক্রান্ত। স্বাভাবিক ভাবেই সে ডিপ্রেশনের রোগী। ২০১৯ সালে একবার নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এতকিছু সত্ত্বেও প্রশ্নটা থেকে যায় এইসব কিশোর এবং তরুণরা কেন এত হিংস্র হয়ে গণহত্যার প্রবৃত্তি হয়। জেনেশুনেই যে সে নিজেও ধরা পড়বে এবং নিহত হবে।

এর উত্তর যতটুকু যুবসমাজের ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে আছে, তার থেকে বেশি এবং সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে আমেরিকার যুবমানস সহ শ্বেতাঙ্গ নাগরিক সমাজের মানসিকতায় ফ্যাসিবাদী অপচেতনা ক্রমশ বেড়ে ওঠার প্রবণতায়। ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনধারণ এবং তার বাড়াকমার বিষয়ে বিশ্ববাসী গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আজ পর্যন্ত যত নমুনা দেখেছে, জেনেছে বা বিভিন্ন ইতিহাসকার ও সমাজতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সম্ভবত অন্য কোনো ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া বা বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রবণতার বিষয়ে ততটা হয় নি। ফ্যাসিবাদের উত্থানের দেশকাল নির্বিশেষে কারণগুলি অনুসন্ধানের আগে এর মোটামুটি কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে আমরা পরিচিত। যেমন, (১) এক ধরনের জঙ্গি সাংস্কৃতিক হিংস্রতা (২) একজন সর্বজনগ্রাহ্য অতি পরাশ্রমশীল নেতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য (৩) গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস, (৪) গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণকারী বুদ্ধিজীবীদের অশ্রদ্ধা ও তাদের ব্যাখ্যাসমূহ নস্যাৎ করা (৫) জাতপাত ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় ভিত্তিক উগ্র গোঁড়ামি (৬) অতীতের কোনো সাম্প্রদায়িক ধার্মিক বর্ণগত ঐতিহ্যের গৌরবগাথার আধুনিক সমাজে জোরজবরদস্তি করে পুনর্নির্মাণ, (৭) আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধিতা, (৮) নারীবাদ ও লিঙ্গগত সাম্যের বিরোধিতা এবং বস্তাপচা শুদ্ধ জিনের পুনর্নির্মাণের সঙ্গে যৌন আধিপত্য (৯) সর্বদা মিথ্যার ভিত্তিতে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব নির্মাণ, অবশ্যই কোনো বিশেষ সম্প্রদায় ও বর্ণগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠীকে 'অপর' চিহ্নিত করে। (১০) রাষ্ট্র এবং সমগ্র নাগরিক সমাজের মধ্যে একটি ফ্যাসিস্ট পার্টির নির্মিত বর্ণ সম্প্রদায় বা ধর্মীয় একপাথুরে ঐক্যের বাহানায় ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার সপক্ষে সম্মতি নির্মাণ ইত্যাদি।

আমেরিকায় বেড়ে চলা বর্ণবিদ্বেষ ও ফ্যাসিস্ট ভাবনার লক্ষণগুলি হিংসা, লাগামছাড়া দুর্নীতি, ভোটে জাল জুয়াচুরি এবং ক্রমাগত বর্তমান সুপ্রীমকোর্টের একটির পরএকটি রায়ে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি মজবুত হওয়ার লক্ষণসমূহ ভীষণই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভাবা যায়, সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কিভাবে নারী সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে গর্ভপাত বিরোধী আইনের পক্ষে রায় দিতে পারে। শুধু তাই নয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার থেকে শুরু করে বিপর্যস্ত পরিবেশ রক্ষা করার অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়ার পক্ষে রাষ্ট্রকে সুপারিশ করছে শীর্ষ আদালত।

ভুলে গেলে চলবে না যে, আমেরিকার পুঁজিবাদী গণতন্ত্র জন্মলগ্ন থেকেই দাসব্যবস্থার নিপীড়ন ও গণহত্যার কলঙ্ক বহন করছে। যখনই সেই হিংস্র প্রবণতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে হ্রাস পেয়েছে বা বন্ধ করা হয়েছে, তখন হিংস্রতা ফুটে বেরিয়েছে অর্থবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য এবং পরিবেশের নির্বিকার ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। তবুও আমেরিকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেমে থাকেনি। যখনই ফ্যাসিবাদি চেতনা মাথাচাড়া দিয়েছে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাগিদ তখন রাষ্ট্রকে সেই পথ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। অতীতের তীব্র শ্বেতাঙ্গ অধিপত্যের গোষ্ঠী কু ক্লাক্স ক্লানকে প্রশমিত করেছে। মার্কিনী ধনকুবের ও অত্যাচারী শাসকদের নিপীড়নে উত্তর আমেরিকায় জনজাতির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পর দক্ষিণের জনজাতিদের উত্তরে পরিযায়ী হওয়া থেকে স্থায়ী বাসভূমের অধিকার ও সেই গণতন্ত্রের পরিসর বিস্তৃত করেছে। আবার ১৯৪১ সালে জাপানের পার্ল হার্বার আক্রমণের পর সারাদেশ ব্যাপী গণতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটে।

আবার নয়াউদারবাদী জমানায় গত তিনদশকে উগ্র খ্রিস্টীয় শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের উপর সমাপতিত হয়েছে উগ্র আগ্রাসী পুঁজিবাদ নির্ভর নয়াউদারবাদ। পৃথিবীর বহু দেশেই অর্থাৎ ভারতে, হাঙ্গেরীতে, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে সংকটগ্রস্ত অর্থনীতির আবহে এই ধরনের ধর্মীয় অথবা বর্ণবৈষম্য ভিত্তিক উগ্রজাতীয়তাবাদকে নির্ভর করে সামান্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অধিকার রহিত আগ্রাসী নয়াউদারবাদ বেঁচে থাকতে চাইছে। খুব সহজেই এই জনপ্রিয় চরমপন্থা যুব সমাজের মননে অভ্যাসে অনুশীলনে স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধছে। আর এই পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র সহ মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসকারী ব্যবস্থার রক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের পক্ষে সম্মতি ও একাধিপত্য স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসছে, কখনও সরাসরি সংসদীয় গণতন্ত্রের গরিষ্ঠতা নির্ভর আধিপত্য, কখনো সেনাবাহিনী, পুলিশ, কখনো বা বিচারব্যবস্থা।

বিরোধিতা ও অপরাধ সমার্থক নয়

২০১০ সাল থেকে ভারতীয়রা প্রায় ৩০ লক্ষ ঘণ্টা কারান্তরালে রয়েছেন দেশদ্রোহিতার অপরাধে। একজন অভিযুক্ত নিম্ন আদালতে জামিন মঞ্জুর হওয়ার আগেই ৫০ দিন এবং উচ্চ আদালতে জামিনে সাময়িক খালাস পাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় ২০০ দিন কারাগারে আটক থাকতে বাধ্য হন। NCRB-র তথ্য অনুযায়ী ১০০০০ এরও বেশি ভারতীয় ২০২০ সাল থেকে এমন ফাঁদে আটক রয়েছেন, এমনই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে বলা যেতেই পারে ঔপনিবেশিক আমলের বস্তাপচা 'দেশদ্রোহ' আইন (১২৪এ, IPC) আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা উচিৎ। শীর্ষ আদালতের দেশদ্রোহ আইনকে স্থগিত রাখার আদেশ দেওয়ার পর ১৫২ বছরের প্রাচীন আইনটির পরিণতি নিয়ে নাগরিকেরা উদ্বেগে রয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই আইন পুনর্বিবেচনার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরও উদ্বেগ থাকছেই।

মুখ্যত এই আইনটির বাতিল হওয়া নিয়ে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, ২০১৯ সালের নির্বাচনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ছিল AFSPA এবং দেশদ্রোহ আইন বাতিল করা হবে এবং এর জন্য কংগ্রেসকে বিজেপি'র তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের দলিল বলা হয়েছিল কংগ্রেসী নির্বাচনের ইস্তাহারকে। অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশদ্রোহী আইনে এবং AFSPA বাতিলের দাবির বিরোধিতা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, যারা এমন আইনগুলির বাতিলের কথা বলেন, তারা আসলে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং সেনাবাহিনীর মনোবলকেও ধ্বংস করতে চায়। আজ শীর্ষ আদালতের চাপে 'দেশদ্রোহ' আইন পুনর্বিবেচনার কথা বলা হলেও এত সহজে সন্দেহমুক্ত হওয়া অসম্ভব কারণ যে কোনো বিরোধিতাকেই বর্তমান শাসক দলটির অপরাধ হিসাবে গণ্য করার অজস্র দৃষ্টান্ত জাতীয় মহাফেজখানার রেকর্ডে নথিভুক্ত আছে।

সংবিধান সংশোধনী আইনের বিরোধিতার জন্য (anti CAA protest) ২৮৬২ জন নাগরিক দেশদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। ২০২১ সালের কৃষকদের প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় ১৩৩ জন কৃষকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলওয়ামা হামলার পর ৪২ জনের বিরুদ্ধে, কৃষি বিল সমর্থনের অপরাধেও ৫৯ জন সাংবাদিকদের দেশদ্রোহী আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিগত ৭ বছরে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখ 'দেশদ্রোহ আইন' দিয়ে বন্ধ করা প্রবণতা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। ২০১৪ সালের পর থেকে প্রতিবছর দেশদ্রোহ আইনে অভিযুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রায় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন 'সুন্দর' রেকর্ড থাকার পরও মনে হতে পারে সরকারের হয়ত হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এত সহজে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবে যদি দেশদ্রোহ আইনটি বাতিলও হয়, আরও মারাত্মক UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) এর অস্ত্র তো মজুত রয়েছেই। সন্ত্রাস বিরোধী আইন UAPA প্রত্যাহার না হলে বিরোধিতাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার ধারাবাহিকতা চলবেই।

দেশদ্রোহ আইনের অভিযুক্তদের পক্ষে জামিনে মুক্ত হওয়া বা অন্যান্য সাংবিধানিক পদ্ধতির সাহায্য পাওয়াটা UAPA -র তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন হিসাবে UAPA তে গ্রেপ্তার হলে ১৮০ দিন পর্যন্ত বিনা চার্জশিটে আটক রাখা সম্ভব। ধরেই নেওয়া হয় আটক ব্যক্তিটি অপরাধী। অপরাধীরই প্রমাণ করার দায়িত্ব যে সে অপরাধী নয়। এমন পরিস্থিতিতে UAPA তে আটক নাগরিকের জামিনে মুক্ত হওয়াটাও বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভিমা কোরোগাঁও মামলা বা দিল্লী দাঙ্গায় অভিযুক্তরা আজও জামিনে মুক্ত হতে পারেনি।

তাছাড়া দেশদ্রোহ আইনে সাজা হওয়া ঘটনাও তুলনামূলক বিচারে অনেক কম। ২০১৪-২০-এর মধ্যেও দেশদ্রোহ আইনে অভিযুক্তদের মধ্যে মাত্র ৯ জনের সাজা হয়েছিল। পাশাপাশি UAPA আরও অনেক বেশি কঠোর। এই আইনে অভিযুক্তদের সাজা পাওয়ার ঘটনা অনেক বেশি। ২০১৪-২০ এর মধ্যে UAPA তে অভিযুক্তদের মধ্যে ২৭.৫ শতাংশ সাজা পেয়েছেন (দেশদ্রোহ আইনে মাত্র ২.২৫ শতাংশ)।

কাজেই দেশদ্রোহ আইন বাতিল হলেও UAPA কে অক্ষত রাখলে বাস্তব পরিস্থিতির তেমন কিছু হেরফের হবে না। আরও মারাত্মক ঘটনা ২০১৪-২০র মধ্যেও মোট ৬৯০০টি UAPA তে আটক মামলার মাত্র ৪.৫ শতাংশ মামলার বিচার শুরু করা সম্ভব হয়েছে। বিচার পর্ব শেষ হওয়া তো দূরের কথা। ২০১৪-২০ সালের মধ্যে ৯৫.৪ শতাংশ মামলাই ঝুলে রয়েছে। সুতরাং "Justice Delayed is Justice Denied" শুধুমাত্র কথার কথা, বাস্তবে অপ্রাসঙ্গিক। আশা করা যেতে পারে শীর্ষ আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পর দেশদ্রোহ আইনে অভিযুক্তরা অবিলম্বে অন্তত জামিনে মুক্ত হবেন, কিন্তু UAPA আইনে অভিযুক্তদের পক্ষে জামিনে মুক্ত হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। UAPA তে এমন কতকগুলি ধারা আছে যার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। দেশদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক হৈচৈ হলেও আরও মারাত্মক দানবীয় UAPA র বিরুদ্ধে জনমনে এখনও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সংবাদ মাধ্যম কার্যত নীরব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্তমান ভারতে নাগরিক স্বাধীনতা এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে— দেশদ্রোহ আইন বাতিল হলে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন যন্ত্রে খানিকটা টোল খাতে বটে, কিন্তু UAPA বাতিল না হলে বাস্তব পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই মনে হয়। যে কোনো বিরোধিতাকেই অপরাধ হিসাবে গণ্য করার ট্রাডিশন চলছে চলবে।

চা বাগান ও মহিলা শ্রমিকদের সংকট

সর্বানী ভট্টাচার্য

ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চলের ঠিক নিচে উত্তর বাংলার ডুয়ার্স অঞ্চল। এখানকার আলিপুরদুয়ার লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্র। প্রসঙ্গত আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত মাদারিহাট ও কালচিনি এই দুটো কেন্দ্রেই মহিলা ভোটার সবচেয়ে বেশি। এই অঞ্চল মূলত চা বাগান এবং নদী ঘেরা। এই অঞ্চলে বেশিরভাগ মানুষই আদিবাসী। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজের খোঁজে যত মানুষ এখানে এসেছিল তারা বেশিরভাগই আদিবাসী। আদিবাসী মহিলা শ্রমিকরা খুব দীর্ঘাকৃতি নন বরং মুখশ্রীতে আছে অজস্র কুঞ্চনরেখা, কানে বড় ফুটো আর তাতে অলংকার গুঁজে দেওয়া আছে। দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি তোলার মাঝখানে অবসরে এরা ভাত খেয়ে নেন চায়ের লিকার দিয়ে, এটা কোন গল্প নয়, এটাই বাস্তব। চা বাগানের শ্রমকারী মহিলাদের আজও আমরা দেখি পিঠে টুকরি আর বুকে কাপড় দিয়ে বাঁধা তার কোলের শিশুও। এভাবেই সে পাতা টুকরিতে ফেলছে। কারণ একাজেই চলে তাদের সংসার। শিশুকে ক্রেশে রেখে আসার মতন সুযোগ অতীতেও তার ছিল না, বর্তমানেও সে সুযোগ নেই। এরা পায় না ন্যূনতম মজুরিও। এই মহিলা শ্রমিকদের শিক্ষার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। বস্তির ছোট ছোট ঘরে বছরের পর বছর তারা তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়। দুপাশে সুন্দর শোভা, চা বাগানের দৃশ্য যখন হাজার হাজার পর্যটকের মন ভোলায় তখন এই শ্রমিকদের জীবনেই রয়ে যায় দুঃসহ অন্ধকার। টুকরি ভরা পাতার বিনিময়ে যে শ্রম মূল্য তাতে অতীতেও উদরপূর্তি হত না, আজও হয় না। তাই মা ও শিশুর রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি শরীরে থেকে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু ইস্তক। এর কোনো পরিবর্তন নেই।

যদিও এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই শোষণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে। তাহলেও নারী শ্রমিকদের কথা আলাদা করে লেখা কেন? কারণ, নারী শ্রমিক ঘরে বাইরে উভয় জায়গায়ই নির্যাতিত। বাগানের কাজের সঙ্গে তাদের ঘরের কাজও করতে হয়। আগুন জ্বালাবার লকড়ি থেকে জলের কলে লাইন দিয়ে জল তোলার দায়িত্ব আজও মহিলাদের। কারণ একবিংশ শতকে কুলি লাইনে ঘরে ঘরে জল বা আলো ঢোকেনি। চা বাগানের ম্যানেজারদের থাকার জায়গায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ নয়া প্রযুক্তি যতই পৌঁছক কুলি লাইনের কুলি কামিনের জন্য তা সহজলভ্য নয়। আর সেই কঠিন কাজই মহিলাদের করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলে আসছে। ''রাজা আসছে রাজা যাচ্ছে'' কিন্তু চা বাগানের মানুষের জীবনে কোনো বদল নেই। এখনো চা বাগানের চারপাশে দুর্বল, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মহিলাদের দেখা যায়। মনে রাখতে হবে শোষক আছে বিভিন্ন রূপে, কখনো রাষ্ট্র, কখনো মালিক, কখনো বা স্বামী পরিবার। আর এই মহিলা শ্রমিক সংসারের জন্য শুধু কাজ করে না, তাতে শ্রমিক পরিবার পুষ্টও হয়। কিন্তু এই পরিবারের প্রয়োজনে, সমাজের কারণে আবার ডাইনি সাজায় এই অসহায় মহিলাদের। ''সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ''। ১৮৮৬ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের শ্রমিকদের দুর্দশার কথা লিখেছিলেন। অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ তখনও সমস্যা ছিল, আজও ১৩৫ বছর পর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সেই একই অবস্থা। দুঃখের হলেও এ কথা সত্য যে, নারী শ্রমিকদের সমস্যার কথা কোথাও তেমনভাবে উঠে আসেনি। স্বাধীনতা উত্তরকালে ডুয়ার্সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠল। ডুয়ার্সের চা বাগানে শ্রমিক আন্দোলনের একটা বিশেষ ইতিহাস আছে। স্বাধীনতার পরে প্লান্টেশন লেবার অ্যাক্ট যে ১৯৫২ সালে চালু হলো। তথাপি অদ্যাবধি বহু শ্রমিকের ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা পড়ে না, অজস্র শ্রমিক গ্র্যাচুইটির টাকা পায় না। এ ধরনের বঞ্চনা যে শ্রমিকের জীবনে থাকে তাদের অনাহার অপুষ্টি যে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল দিনের পর দিন যদি এভাবে চলতে থাকে, বাচ্চারা অভাবের কারণে মারা যায়, প্রতিনিয়ত নারী ও শিশু পাচার ঘটে। এসব সত্ত্বেও কি শ্রমিকদের চুপ করেই থাকতে হবে?

পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধি করতে অথবা বাগানের সর্বেসর্বা ম্যানেজাররা দাপটে ঘুরবে আর শ্রমিকেরা কি শুধুই চেয়ে চেয়ে দেখবে? এটাও তো চলতে পারে না। তবে দুঃখের হলেও একথা সত্যি যে, কষ্ট সহ্য করতে করতে এরা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনো জেহাদ ঘোষণা করলে তা গভীর অপরাধ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডুয়ার্সের চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৭৫ বছর লেগেছিল ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি হতে। চা বাগানে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে আন্দোলন করার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে ডুয়ার্স চা-বাগিচা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ এইচ বেস্টারউইচ, ননী ভট্টাচার্য, গোপাল মৈত্র, মধু রাউত, আয়েতা গুরুং, সুরেশ তালুকদার প্রমুখ সহ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা তাদের জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইকে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছিল। ননী ভাই সহ তৎকালীন নেতাদের উপর শ্রমিকদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। আজও শ্রমিকদের ঘরে ঘরে এই নেতাদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আছে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবি নিয়ে লড়াই করতে এঁরাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর বহু দিন কেটে গেছে। আজও তাদের অবস্থা খুব বেশি পাল্টায়নি। ডক্টর বিনায়ক সেন গবেষণা করে দেখেছেন যে উত্তরের চা বাগানগুলো ৪০ শতাংশ মানুষের বি এম আই (বডি মাস ইনডেক্স) ১৮.৫ -এর নিচে। অর্থাৎ, তারা অপুষ্টির শিকার। মহিলা ও শিশুদের অবস্থা আরো খারাপ, রক্তাল্পতা তাদের নিত্যসঙ্গী। বাম সরকার চলে যাবার পর অবস্থা আরো কঠিন হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষার পুরোপুরি সুযোগ এখনো চা বাগানের লোকেরা পাচ্ছে না, দু টাকা দামের চাল ঘরে ঘরে পৌঁছোনোর নিশ্চয়তা আজও তৈরি হয়নি। অন্যদিকে মদ্যপান, জুয়া খেলা, কুসংস্কার, অশিক্ষা, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে কোনো সামাজিক আন্দোলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এখানে যে বিষয়টা উল্লেখ করতে চাই তা হল ২০১৪ সালে সোনালী চা বাগানের মালিক রাজেশ ঝুনঝুনওয়ালা খুন হয়। এটাকে শ্রমিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বলে দেখানো চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, যেমন দীর্ঘদিন শ্রমিকদের বেতন দেয়নি তেমনি ৩০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগও তার নামে ছিল। এইসব বাগান মালিক ক্রিমিনালরাই বর্তমানে সরকারি মদতে চা-বাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কালচিনির মধুবাগান থেকে বাগড়াকোটের সোনালী চা বাগান সর্বত্র এদের রমরমা। ২০১৪ সালের শ্রমদপ্তরের রিপোর্টেই এ কথা বলছে যে, বেশ কিছু চা বাগান এখন প্রোমোটারদের দখলে। তারাই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তা না মিটিয়ে পালিয়ে যায় এবং পি এফ, গ্র্যাচুয়িটির টাকা দেয় না। বোনাসের সময় এরাই শ্রমিক অসন্তোষের নামে পালিয়ে যায়। তবে একথা বলতেই হবে যে, এর বিরুদ্ধে যেভাবে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠা দরকার ছিল তা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতাদের উপর অবিশ্বাস কাজ করেছে যা, আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়নি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো চাবাগানে ট্রেড ইউনিয়নে মহিলা শ্রমিকদের ভূমিকা খুবই কম, যদিও বাগানে ৮০ শতাংশই মহিলা কর্মী, তারা সকলেই কোনো না কোনো সংগঠনের সঙ্গে আছে। কিন্তু কোথাও তারা নেতৃত্বে নেই। মধ্যবিত্ত গ্রাম গঞ্জ শহরের নেতারাই চা বাগানের শ্রমিকদের সভায় এসে বক্তৃতা দেন, আর মেয়ে শ্রমিকেরা শ্রোতা। সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় অদ্যাবধি তাদের স্থান নেই। অবশ্য এসব করার জন্য যে সচেতনতা আইন-কানুন সম্পর্কে জ্ঞান থাকার দরকার হয় তাও তাদের নেই। সেই সচেতনতা তাদের কেউ দেয়ওনি। ফলে দীর্ঘকাল ধরে এই অবস্থা রয়ে গেছে। এছাড়া মহিলা শ্রমিকদের সাক্ষরতার হারও অত্যন্ত কম।

প্লান্টেশন অ্যাক্টে শিশুদের ক্রেশ ব্যবস্থা রাখার কথা আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরকম কোনো সুযোগই প্রায় নেই। বরঞ্চ ছোট ভাই বোনকে দেখবার জন্য বাচ্চাদের দিয়ে মা-বাবারা কাজ করায়, যুগের পর যুগ সেই একই অবস্থা চলছে। কিন্তু এই সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে কোনো আন্দোলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে ছোটবেলা থেকেই সংসারের কাজেও বাধ্য হয়ে এরা যুক্ত হয়ে পড়ে, পাতা তুলেই এদের জীবন কাটলো, কোনো আলোর নিশানা এরা পেল না। যদিও এ মহিলারা অত্যন্ত সাহসী, প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতেও তারা পিছপা হয় না কিন্তু তবু তারা উপেক্ষিত থেকে গেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে ছিল অনেক আশা নিয়ে কিন্তু, কোনো কাজই তারা করেনি। তাদের এই আচরণই স্বাভাবিক। তৃণমূল ও বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু, কিছু করার উদ্যোগ নেয়নি। না হলে চা বাগানের জন্য বরাদ্দ ১০০০ কোটি টাকা কোথায় গেল? ২০২১-২২ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বাজেট অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শ্রমিক পরিবারের মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে লাগানো হবে বলে ঘোষণা হয়েছিল, সেজন্য বিশেষ একটি প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার একভাগও বাংলা ও অসমের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছয়নি। তৃণমূল সাংসদরাও সংসদের অভ্যন্তরের তেমন কোনো আওয়াজ তুলেছে বলেও জানা যায়নি। চা বাগানের শ্রমিকরা তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

রাজা আসে, রাজা যায়,
জামা কাপড়ের রং বদলায়,
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়,
দিন বদলায় না।

দিন বদলের লড়াইকে ত্বরান্বিত না করতে পারলে, শ্রমিকের লড়াই শ্রমিককে যুক্ত করে নেতৃত্বে না আনতে পারলে, মহিলাদের সচেতনতার লড়াই কয়েক কদম এগোনোর কাজে অগ্রণী করতে না পারলে, শুধু অন্ধকারের কড়চা লিখে লাভ নেই। এইসব শ্রমিক পরিবারগুলি ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ থেকেও বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। মানবিকতার বোধ পর্যন্ত এখানে অবহেলিত। মালিকদের প্রভূত মুনাফার লোভ মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না।

এমন এক বিষম অবস্থা দেশের অগ্রগতির পথে এক দুস্তর বাধা। এই বাধার সম্যক অপসারণ ঘটাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমকারী মানুষদের দুর্বার ঐক্য ও আন্দোলন একান্ত জরুরি।

মোদী জমানায় ফ্যাসিবাদী শাসনের ঝোঁক...

১-এর পাতার পর

সমস্ত প্রশ্নের উর্ধে তুলে ধরতে হবে। বর্তমান মোদী সরকারের সার্বিক বিফলতা নিয়ে তেমন কোনও সন্দেহ আর নেই। দেশে নিদারুণভাবে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। সাধারণ পরিবারগুলি এর চাপে জেরবার। পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে খুচরো বাজারে বহু সংখ্যক মানুষ আর পৌঁছোতেই পারছেন না। কলকাতা শহর বা শহরতলীর অনেক বাজারেই গ্রাহকদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এর ফলে বহু ছোট দোকানদার বা আনাজপাতি নিয়ে ব্যবসা করার মানুষরা আর দোকান সাজিয়ে বসতেই পারছে না। বিক্রি বাটায় চরম মন্দা এক শ্রেণির ছোট ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব সংকটে পর্যবসিত হচ্ছে।

এসবের ওপর মোদী জমানায় রান্নার গ্যাসের দাম লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে একটি সিলিন্ডারের দাম প্রায় এগারোশো টাকা। অনেক পরিবার এত বেশি দামের বোঝা বহন করতে অক্ষম। মোদীর বহু বিজ্ঞাপিত 'উজ্জ্বলা' গ্যাসে যে সব পরিবারগুলি রান্নার গ্যাস পেয়েছিল, তারা আর নতুন সিলিন্ডার কিনে ব্যবহার করার অবস্থায় নেই। এত বেশি দাম অতীতে কোনদিন ভারতের মানুষকে দিতে হয়নি।

গরিব অংশের বহু মানুষ রান্নার জন্য কেরোসিন তেলের ওপর নির্ভরশীল। রেশন মারফৎ কেরোসিন তেল অধিকাংশ সময়েই পাওয়া যাচ্ছে না। পেলেও দাম লিটার প্রতি ৯১ টাকা। খোলা বাজারে যে কবে কি দামে কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে তার কোনই মা-বাপ নেই। ভরতুকি সহ গ্যাসের সিলিন্ডার কেনাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। গ্রামে গঞ্জে বহু পরিবার আদ্যিকালের কাঠ-পাঠকাঠি বা সমগোত্রীয় জ্বালানির ওপর ভরসা করছে। এরপর হয়তো অরন্ধনই শুরু হয়ে যাবে। পরিবেশ ধ্বংসের কথা না হয় নাই বলা হল।

চাল, ডাল, ভোজ্য তেল প্রভৃতির দাম তো অনেকদিন যাবৎ অত্যধিক চড়া বা লাগামছাড়া। মোদির পোষ্য ব্যবসায়ী আদানি এবং রামদেবের ব্যবসাকে মদত দিতে সরিষার তেল বা সাদা তেলের দেদার দাম বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে মোদী সরকার। 'ফরচুন' তেলের বিক্রি বাড়াতে অন্যান্য তেলের দামও কমাতে দিচ্ছে না মেদী প্রশাসন। তাঁর চরম তঞ্চকতার বহর বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষ প্রায় দিশাহারা অবস্থায়।

যদি বেকারত্বের চরম অভিশাপের প্রশ্নে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে, বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই যে করোনা অতিমারির প্রকোপে যে বহু কোটির বেশি মানুষ জীবিকার সংস্থান হারিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশই আর সেসব চাকুরি ফিরে পাননি। নতুন কোনও কলকারখানাও মোদী জমানায় গড়ে ওঠেনি। পরিষেবা ক্ষেত্রেও নিদারুণ মন্দা দীর্ঘকালীন অনড় অবস্থানে পরিণত। শ্রমশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ সদ্ব্যবহারে এই সরকারের কোনও উৎসাহই নেই। শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পূর্ণত খর্ব করাটাই সরকারের মুখ্য লক্ষ্য। শ্রম আইনগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে শ্রম কোড চাপিয়ে দিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের একান্তভাবে 'পুঁজিদাসে' পরিণত করার প্রকল্প চলছে। সর্ব ধরনের অনৈতিকতা শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করছে। আর কোনও সামাজিক নিরাপত্তা থাকছে না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, তাঁদের চাকুরিকালের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে যেটুকু পেনশনের ব্যবস্থা চালু ছিল, তারও অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে দ্রুত।

ভারত শ্রীলঙ্কার মত একই রকম নৈরাজ্যে পড়েছে একথা বলার সময় নিশ্চিতই আসেনি। তবে যেভাবে দেশের সরকার চলছে তার অবধারিত নিয়তি সেটাই। বিরোধী পক্ষের দলগুলি বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেস তার নিজস্ব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই পারছে না। নিজেদের পুরনো দিনের পাপ তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র বামপন্থী দলগুলিই ঐক্যবদ্ধ আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে গণমুক্তি ঘটাতে পারে।

Vol. 70 Issue No. 18 শনিবার ৯ জুলাই, ১৬ জুলাই ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

সুপরিকল্পিত ভাবেই ভন্ডামী করছে তৃণমূল কংগ্রেস

তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিনায়িকা থেকে শুরু করে প্রথম সারির নেতার দলবল যখন যেমন মনে হয়, সেভাবেই মিথ্যা প্রচার করতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গতকালই যে কথা এঁরা জোরের সঙ্গে বলেছেন, আজ সকালেই দেখা গেল পুরো উল্টোসুরে কথা বলছেন। আর জনমোহিনী দানধ্যান প্রতিশ্রুতির বিষয় হলে তো কথাই নেই। ভোটের দামামা বাজতে শুরু করলে সমান হারে চড়তে থাকে মিথ্যা বলার হার।

এই যে মিথ্যে বলা, এটিকে আলটপকা কোনো মন্তব্য বলে ভাবা মুশকিল। খুব পরিকল্পিত ভাবেই এরা মিথ্যা কথাগুলো বলে থাকেন। যেমন যে সময় নরেন্দ্র মোদীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে যাবেন হয়তো সিবিআই, ইডি, সেবির হামলা থেকে নিজে, তার ভাইপো সহ আত্মীয়স্বজন বা তৃণমূল নেতৃত্বকে গার্ড দিতে। তখনই রাজ্যে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন।

আর তৃণমূল নেত্রীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু বামফ্রন্ট। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে তাঁর এবং তাঁর চেলাচামুন্ডাদের তো জুড়ি নেই। তাছাড়া বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে গড়ে তোলা আর্থসামাজিক পরিকাঠামো, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক অধ্যাপকদের বেতন কাঠামো ইত্যাদির অবদান নস্যাৎ করতে যতদূর সত্য মিথ্যে জুড়ে গল্প বানানো যায়। এ ব্যাপারেও এরা যথেষ্টই সিদ্ধহস্ত।

সদ্য সদ্য ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সল্টলেক পর্যন্ত উদ্বোধন নিয়ে এখন মমতার ডানহাত কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের আফশোসমিশ্রিত জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটার কথাই ধরা যাক। মেট্রো প্রকল্প নাকি তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মস্তিষ্কপ্রসূত। অথচ তাঁকেই কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাকে নি।

আসলে মমতার মস্তিষ্ক অনেক সাহিত্য-কাব্যকাহিনী প্রসব করে রাজ্য সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার ছিনিয়ে আনতে পারলেও এপর্যন্ত কোনো স্থায়ী বা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ভাবনা বা শিল্প বিকাশের ভাবনা প্রসব করতে পারেনি। স্বপ্নে এবং কল্পনায় তিনি অনেক কিছু দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই প্রতিফলিত হয় নি এরাজ্যে।

মেট্রো প্রকল্পের শিলান্যাসের ঘটনাটি ঘটে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বিধাননগরে বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিলান্যাস করেছিলেন। পাশে ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি, সাংসদ মহম্মদ সেলিম ও রাজ্যের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তখন এই প্রকল্প আদৌ রেলমন্ত্রকের অধীন ছিল না। ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রকল্পের পিছনে আদা জল খেয়ে লেগেছিলেন। শেষে প্রণববাবু যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনটা করিয়ে আনতে পেরেছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক দায় নেবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য এই দায়ভাগটা পুরোটাই নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আসল কথা ২০০৯ এর ২২ ফেব্রুয়ারি সময়টা ছিল সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে। মমতা কিন্তু তখন ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রীসভায় নেই। ইউ পি এ সরকারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অনুমোদন ক্রমে সর্বপ্রথম গঙ্গাবক্ষের নীচ দিয়ে মেট্রো প্রকল্পের সিদ্ধান্ত করাতে সক্ষম হন।

এই বিষয়ে নির্জলা মিথ্যা বলে গেলেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যবাসী এই মিথ্যা শুনতে এতই অভ্যস্ত, তাঁরা যেন ভুলেই গেছেন এই প্রকল্প সম্বন্ধে সেদিন মমতা কি বলেছিলেন। মনমোহন সিংকে উদ্দেশ্য করে মমতার সেদিন করা বিবৃতি, ''ঋণভারে জর্জরিত রাজ্যকে কেন এত টাকা দিচ্ছেন। লোকসভা ভোট চলে এসেছে। এখনও সিপিএমকে এত তোয়াজ করছেন কেন?''

আর প্রণব মুখার্জীকেও গাল দিতে ছাড়েন নি মমতার 'হার মাস্টার্স ভয়েস' পার্থ চ্যাটার্জী, ''সি পি এমের পদলেহনকারী বাংলার নায়ক এই প্রণব।'' শুধু তাই নয় এই শিলান্যাসকালে এই প্রকল্পে আগত উদ্বোধকদের কালো পতাকা দেখাতেও কসুর করে নি তৃণমূল কংগ্রেস। এই ধরনের ডিগবাজি খাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের জিনগত প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তি ইদানিং বিজেপি বনাম তৃণমূল কংগ্রেসের বাইনারি সৃষ্টি করে সবল ও সজীব রাখার ক্ষেত্রে ভোটের বাজারে ভালই কাজ দিচ্ছে। মানুষের দৈনিন্দন জীবন জীবিকা, মূল্যস্ফীতি, বেকারত্বের বিষয়গুলি অস্পষ্ট করে তুলতে রাজ্য ভাগ, মহাকালী বিতর্ক, এন আর সি বিতর্ক, সাম্প্রদায়িক হানাহানির ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের তর্ক বিতর্কগুলি বার বার বাজারে আনছে বিজেপি এবং তৃণমূল। কর্পোরেট প্রচার মাধ্যম এ বিষয়ে ধুনো দিয়ে চলেছে। যেমন আজ উত্তরবঙ্গে এক জনসভায় সিংহগর্জনে অভিষেক ব্যানার্জী তৃণমূল কংগ্রেসের এখন দুই নম্বর নেতা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী ঘোষণা করেছেন, ''তৃণমূলের অভিধানে উত্তরবঙ্গ শব্দটি থাকবে না।'' তাঁর পিসি যখন সরকারি সফরে এবং জি টি এ প্রশাসন গঠনে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তখন এই বক্তব্য ভীষণ পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। আসলে অভিষেকের বক্তব্যের তিরটা ছোঁড়া হয়েছে বিজেপির ভিন্ন রাজ্য গঠনের শ্লোগানের দিকে লক্ষ করে। এতই ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই বক্তব্য যে, অভিষেক ভুলেই গেছেন যে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর গঠন করে তার জন্য একজন পূর্ণদায়িত্বের মন্ত্রী বহাল করেছেন।

অথচ উত্তরবঙ্গ শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের আবেগ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা ও ভাষার বৈচিত্র, ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ুর পার্থক্য সবকিছুই নিয়ে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং জেলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য গাছগাছালি, চা বাগিচা, পাহাড়ের গা বেয়ে সুদীর্ঘ গাছের সারি সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ। সুতরাং তৃণমূলের নতুন ভাষ্যে অভিষেকের বয়ানে 'উত্তরবঙ্গ' না থাকলেও উত্তরবঙ্গ আছে এবং থাকবে। এই ধরনের উল্টোপাল্টা ভাষণকে কি বলব, মুর্খতা, অজ্ঞতা, না বিশেষ প্রতিক্রিয়ায় বিষবৃক্ষের ডালপালা বিস্তারের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই দ্বিচারিতাকে দিশাহীনতা বলে ব্যাখা করেন। কখনো অনেকে এইসব বাক্যের আড়ালে মুখ্যমন্ত্রীর সহজ সরল ধরনে ব্যাকরণ বহির্ভূত ভাষা সহ ইতিহাস জ্ঞানের বিচিত্র ধরনধারণকে সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের বা মাটির কাছাকাছি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের ন্যায্যতা দিয়ে থাকেন। আসলে এটাও একধরনের সুপরিকল্পিত বামপন্থী মুখোস পরিহিত কর্পোরেট আঁতেলদের আঁতলামি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষেই যে স্যাঙাৎ পুঁজির পৃষ্ঠপোষকদের একজন হয়ে সংকটগ্রস্ত নয়াউদারবাদী অর্থনীতির জনপ্রিয় মুখ, এটা আড়াল করাই এদের কাজ। তাই যাঁরা বলেন যে আদর্শহীন হলেও তিনি সহজ সরলভাবে মানুষের ভাষা বোঝেন বা এই জনপ্রিয় রাজনীতিই নয়া উদারবাদের বিকল্প, তাঁদের মতো ভন্ড ও মুখোশধারী প্রতিক্রিয়াশীল আর কে আছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মমতার গেমপ্ল্যান এবং দ্বিচারিতার বিষয়ে এরা কিছু কি বলেছেন বা বলছেন? নিজের থেকে সমস্ত বিজেপি বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী কে হবে সেই বিষয়ে সভা ডাকলেন মমতা। গোপন ইচ্ছা সুযোগ পেলে কোনদিন যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়! যা হোক সেই সভায় প্রায় সব দলই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একজন প্রার্থী মনোনয়নের কথা বলল।

আলটপকা কয়েকটা নাম উল্লেখ করেছেন মমতা। তাঁদের সঙ্গে কেউ কোনো আলোচনা না করেই। কেউ রাজী হলেন না। ব্যস মমতার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নের বেলুন চুপকে গেল। পরের মিটিং ডাকলেন শরদ পাওয়ার। সেখানেও অধিকাংশ বাম গণতান্ত্রিক দল উপস্থিত। মমতা ব্যানার্জী পাঠালেন ভাইপোকে। সর্বসম্মত ভাবে ঠিক হল যশোবন্ত সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে পদত্যাগ করবেন এবং বিজেপি'র মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলের প্রার্থী হবেন।

এবার খেলাটা জমে গেল। আদিবাসী এক মহিলা নেত্রী বিজেপি'র মনোনীত রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার পর মমতা ঘোষণা করলেন যে, তিনি আগে জানলে বিজেপি'র আদিবাসী মহিলা প্রার্থীকেই সমর্থন করতেন। অর্থাৎ অনেক আগে থেকেই বিজেপি'র সঙ্গে যে সেতুটা রাজ্যবাসীর চোখের আড়ালে বানিয়ে রেখেছেন সেই সেতুটার কলকব্জাগুলিই আবার টাইট দিয়ে রাখলেন। গরু পাচার, কয়লা লুঠ, সারদা, নারদায় অভিযুক্ত আত্মীয়স্বজন ও দুর্বৃত্ত নেতাদের কারাগারের বাইরে রাখতে হবো তো!

শ্রীহীন দ্বীপরাষ্ট্রে লঙ্কাকান্ড

৩-এর পাতার পর

সপরিবারে নিহত হবার পর থেকেই ক্রমশই তামিলদের আন্দোলন গড়ে তোলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁদের পক্ষে ওই রাষ্ট্রে অধিকারবিহীন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য কোনও কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। অনেকে অবশ্য ভারতে পালিয়ে এসেও বাঁচার চেষ্টা করেছেন।

তামিল ইলম অর্থাৎ, স্বাধীন সার্বভৌম তামিল রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে এখনও বেঁচে থাকা তামিল জনগোষ্ঠীর বৃহদংশ কোনক্রমে সিনহালা ভাষীদের করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন। আবার শ্রীলঙ্কার স্বৈরাচারী ও অনৈতিক শাসকবৃন্দ ২০০৯-এর পর থেকেই ক্রমশ মুসলিম বিরোধিতার পথে চলতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই যেমন খুশি মিথ্যা প্রচারিত হচ্ছে অহরহ। বর্তমান গণবিদ্রোহ হয়তো এর অবসান ঘটাবে।

শ্রীলঙ্কার বর্তমান অবস্থা সতত পরিবর্তনশীল। প্রতিদিনই বেশ কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। গত ৯ জুলাই কয়েক লক্ষ বিক্ষুব্ধ শ্রীলঙ্কাবাসী রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজপক্ষ'র পদত্যাগই শুধু দাবি করেন নি, তাঁরা গোতাবায়া নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী বর্ষীয়ান রাজনীতিক রনিল বিক্রমসিংঘের অপসারণও দাবি করেছিলেন। রনিল এর বাসস্থানে আগুন ধরিয়ে তা ভস্মীভূত করেছেন। গোতাবায়া রাজপক্ষ আত্মগোপন করে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে তিনি ১৩ জুলাই পদত্যাগ করবেন।

ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। গোতাবায়া রাজপক্ষ সরকারিভাবে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা না দিয়েই দেশত্যাগ করেছেন। শোন যাচ্ছে যে, এই খলনায়ক রাষ্ট্রপতি যাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মূল ক্ষোভ, তিনি গোপনে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গেছেন। তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেবার পরে বেশ কিছুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও বজায় রেখেছেন। সেই হিসেবে গোতাবায়া যে শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর হয়ে মার্কিন মুলুকে চলে যাবেন না সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। নানা দেশের বহু স্বৈরশাসক ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে প্রাণ বাঁচাতে ওই দেশেই আশ্রয় নেন।

আগ্রাসী বিশ্বপুঁজিবাদ সম্ভবত শ্রীলঙ্কায় তার স্থিত স্বার্থ আর বজায় রাখতে পারছে না। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ঋণদানকারী সংস্থাগুলির মনোভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শ্রীলঙ্কার বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক সমস্যাবলী থেকে সাময়িকভাবে কোনও সমাধানসূত্র নির্ণয় করতে এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আই এম এফ, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আর উৎসাহী নয়। তারা সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এদিকে কলম্বো বা অন্য সবকটি শহরেই বিক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত এবং হতাশাগ্রস্ত জনগণের প্রতিবাদ প্রবলভাবে বিস্ফারিত হচ্ছে। গভীর রাজনৈতিক ডামাডোল সামলাতে প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংঘে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছেন। সর্বদলীয় কোনও সরকার গঠন করাও প্রসঙ্গত আলোচিত হচ্ছে। কথা চলছে, বর্তমান সংসদের স্পীকারকে রাষ্ট্রপতি পদে রেখে একটি সরকার গঠন করার। কিন্তু ঘটনাবলী যেদিকে নির্দেশ করছে তা, এতটাই জটিল এবং ব্যাপক যে ওই প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হবে কিনা তা এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্রের সাধারণ জীবন যে গভীর নৈরাজ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১৪ জুলাই, ২০২২

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-